প্রকাশক শ্রীপুলিনবিহারী সেন
বিশ্বভারতী, ৬৷৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা

প্রকাশ মাঘ ১৩৫২

মূল্য আট আনা

মুদ্রাকর শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
শান্তিনিকেতন প্রেস, শান্তিনিকেতন, বীরভূম

জ্ঞানোত্তমর্ণ সহকর্মী সুহৃৎ

শ্রীহাজারীপ্রসাদ দ্বিবেদী শাস্ত্রাচার্য,

'বালুকডাঙার বিখ্যাত পণ্ডিত'জী মহাশয়ের করকমলে

সূচীপত্র

সংস্কৃত ভাষা

কাল্‌চার বলতে যা বোঝায় তার বাংলা হোলো সংস্কৃতি। কাজেই সংস্কৃত ভাষা মানে কাল্‌চারড্‌ ল্যাংগোয়েজ্‌, অর্থাৎ শিক্ষিতদের ভাষা। এ-ভাষার আর এক নাম দেবভাষা। সেদিক দিয়ে তার অর্থ হয় যে-ভাষা দেবতার উদ্দেশ্যে যাগ যজ্ঞে বলা হয়। অথবা দেব মানে বিদ্বান, তাদের যে-ভাষা সে ভাষা দেবভাষা। কাজেই সেকালে যিনি এই ভাষা জানতেন না, তিনি সভ্যসমাজে কোনো রকম সম্মানই পেতেন না। তারপর এই ভাষা এদেশের ভদ্রভাষাগুলির মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন। এখনো পর্যন্ত এই ভাষার পঠনপাঠন সমানভাবে চলে আসছে।

আগেকার যুগে বই শুনে শুনে মুখস্থ করে রাখার নিয়ম ছিল এইজন্যে শাস্ত্রের নাম ছিল শ্রুতি, স্মৃতি। যিনি যত বই মুখস্থ রাখতে পারতেন তিনি তত পণ্ডিত বলে গণ্য হতেন আর মুখে মুখেই এই ভাষা ভারতের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। খ্রীস্টপূর্ব চারপাঁচ হাজার বছর আগেও এদেশে লেখার চলন ছিল কিন্তু সে লেখা আর্যদের নয়। তাতে সংস্কৃত ভাষার ধ্বনি লেখা সম্ভবপর ছিল না বলে মনে হয়। মহেঞ্জদাড়ো হরপ্পা খুঁড়ে যেসব মোহর পাওয়া গেছে তার ওপরকার লেখা এখনো পড়তে পারা যায়নি। কিন্তু তাতে প্রমাণ হয়ে গেছে যে অত আগেও এদেশে লেখার চলন ছিল তবুও সংস্কৃত শাস্ত্রগুলি মুখে মুখে চলত। সংস্কৃত ভাষা লেখা হয় অনেক পরে।

বইয়ের খোঁজ

সংস্কৃত লেখার চলন হবার পরেই বিদ্বানেরা নিজের নিজের মুখস্থ বই লিখে রাখেন। সংস্কৃতের নিজস্ব কোনো অক্ষর ছিল না। পণ্ডিতরা নিজের নিজের দেশের প্রচলিত অক্ষরে বই লিখতেন। সেইজন্যে যে-কোনো দেশের প্রাচীন বই দেখলেই দেখা যায় সেগুলি সে দেশের অক্ষরে লেখা।

কাশী হোলো সংস্কৃত শিক্ষার প্রধান কেন্দ্র। কাশীর কাছেই দেবনগর বলে একটা নগর ছিল সেখানকার অক্ষরই কাশীপ্রান্তের লোকেরা লিখে থাকেন। জর্মন পণ্ডিত ম্যাক্সমূলর ঐ দেবনাগরী অক্ষরই সংস্কৃত অক্ষররূপে চালিয়ে যান, এখন সমস্ত ভারত আর তার বাইরেও ঐ অক্ষরই সংস্কৃত ভাষায় ব্যবহৃত হচ্ছে। এমন কি দেবনাগরীর নাম সংস্কৃত অক্ষর হয়ে গিয়েছে। এই ব্যাপার এখন থেকে প্রায় একশো বছরের মধ্যে ঘটেছে।

সেকালে যানবাহনের এত সুবিধে ছিল না, আর ডাকেরও এত ব্যাপকতা ছিল না। কাজেই বিরাট ভারতবর্ষে কোথায় কোন্ পণ্ডিত কোন্ বই লিখছেন তার খবর বড়ো একটা মিলত না। অথচ সবদেশেই বই লেখা চলছিল। ইংরেজ আমলে নানাদেশের সঙ্গে খবরাখবরের সুবিধে ঘটায় ইউরোপীয় পণ্ডিতরাই প্রথমে সংস্কৃত বইয়ের খোঁজ আরম্ভ করেন।

১৮৪০ খ্রীস্টাব্দে এল্‌ফিন্‌স্টোন্ সাহেব খোঁজ করে সংস্কৃত বইয়ের যা সংখ্যা পেয়েছিলেন, তাতে তিনি বলেন যে গ্রীক্ আর ল্যাটিন ভাষার সমস্ত বইয়ের মিলিত সংখ্যার চেয়ে সংস্কৃত বইয়ের সংখ্যা বেশি। কিন্তু তখন সংস্কৃত বইয়ের খোঁজ খুব কমই পাওয়া যায়।

এর আগে ১৮৩০ খ্রীঃ— ফ্রেড্‌রিশ সাহেব প্রভৃতি মাত্র সাড়ে তিনশো সংস্কৃত বইয়ের খোঁজ পান। ১৮৫২ খ্রীঃ বেবর সাহেব স্বকৃত সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে প্রায় ৫০০ বইয়ের উল্লেখ্ করেছেন। তারপর তিনি ১৬০০ বইয়ের কথা লিখে যান। এই রকমে খোঁজের ফলে এল্‌ফিন্‌স্টোনের কথিত সংখ্যা বেড়ে চলেছিল।

১৮৯১ খ্রীঃ— থিয়োডোর অ্যাউফ্রেক্ট ক্যাটালোগস্ ক্যাটালোগোরাম্ নামে একখানি বড়োরকম সংস্কৃত বইয়ের তালিকা তৈরি করেন। তাতে ঐসময় পর্যন্ত যত বইয়ের খোঁজ পাওয়া যায় তার নাম আছে। তার সংখ্যা গিয়ে দাঁড়াল ৩২০০০ হাজারে। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ নেপালে রক্ষিত অনেক অজ্ঞাত সংস্কৃত পুস্তকের সন্ধান পান। সেই সব মিলিয়ে সবসুদ্ধ সংস্কৃত বই হোলো চল্লিশ হাজারের ওপর।

এখনো আবার নতুন নতুন বই আবিষ্কৃত হচ্ছে। আর নানা জায়গায় সন্ধানও মিলছে।

সাংকৃত্যায়ন রাহুল সম্প্রতি আবার খোঁজ দিলেন যে তিব্বতে বহুতর সংস্কৃত বই রয়েছে যা এদেশে অজ্ঞাত। কাজেই মোটামুটি ধরলে প্রায় পঞ্চাশ হাজার সংস্কৃত বইয়ের নামধাম আমাদের হাতের কাছেই আছে।

১৮১৯ খ্রীঃ— সংস্কৃত বইয়ের প্রথম খোঁজ আরম্ভ হয়। জর্মন পণ্ডিত শ্লিগল প্রভৃতি অনেকেই উদ্যোক্তা ছিলেন। কিন্তু তখন ক-খানাই বা বই জানা গিয়েছিল।

এখনো মঠ মন্দির স্তূপের মধ্যে থেকে নতুন নতুন বই পাওয়া যাচ্ছে, এই-রকম নতুন বই ভবিষ্যতে যে কত পাওয়া যাবে তা কে বলতে পারে।

কিসের ওপর লেখা

নানা জিনিসের ওপর এইসব সংস্কৃত বই লিখিত হোত, বেশির ভাগই তালপাতার ওপর লেখা। পাঞ্জাব আর কাশ্মীর বাদে ভারতের অন্যত্র তাল-পাতাই লেখার কাজে ব্যবহৃত হোত।

উত্তর ভারতে তালপাতার ওপর কালি দিয়ে, আর দক্ষিণ ভারতে লোহার কলম দিয়ে তালপাতার ওপর অক্ষর কুঁদে তার ওপর ভুষো বুলিয়ে লেখা হোত (এখনো হয়)।

কালি দিয়ে লেখাকে লেপন, আর কুঁদে লেখাকে লেখন বলা যেতে পারে। লেপন থেকে লিপি, আর লেখন থেকে লেখা শব্দ চলিত হয়েছে।

সবচেয়ে প্রাচীন তালপাতার বই যা পাওয়া গিয়েছে তা দ্বিতীয় খ্রীস্টাব্দের বই। মকার্ট সাহেব কাশগর থেকে যেসব পুরোনো হাতের লেখা বই সংগ্রহ করেছেন তার মধ্যে একখানা চতুর্থ খ্রীস্টাব্দে লেখা। প্রজ্ঞাপারমিতা রহস্য ও উষ্ণীষবিজয়ধারণী নামে ষষ্ঠ খ্রীস্টাব্দে এদেশে লেখা দুখানা বই জাপানে সুরক্ষিত আছে।

তালপাতা বাদে ভূর্জপাতাতে লেখার কাজ চলত। মধ্য যুগে ভূর্জপাতায় লেখা বই বেশ করে ফুঁড়ে বাঁধিয়ে রাখা হোত তারও নিদর্শন পাওয়া যায়। হিমালয়ের পাদদেশে ভূর্জপত্রই বেশি ব্যবহৃত হোত। ভূর্জপাতায় লেখা সবচেয়ে পুরোনো বই যা পাওয়া গেছে তা তৃতীয় খ্রীস্টাব্দে লেখা ধম্মপদ নামে পালি ভাষার একখানা বই।

সংযুক্তাগমসূত্র নামে একখানা বৌদ্ধ সংস্কৃত বই পাওয়া গিয়েছে সেখানা চতুর্থ খ্রীস্টাব্দে লেখা অনেকে মনে করেন।

এদেশে কাগজে লেখা বই সবচেয়ে প্রাচীন যা পাওয়া গিয়েছে তা নাকি ১৩শ খ্রীস্টাব্দের। মধ্য এশিয়াতে খুঁড়ে যে সব বই পাওয়া গিয়েছে তার মধ্যে যেগুলি কাগজে লেখা সেগুলি চতুর্থ খ্রীস্টাব্দের হওয়া উচিত এইকথা অনেকে বলেন। একথা মনে রাখা দরকার যে কাগজ চীনারা প্রথম আবিষ্কার করে, সেও আবার হাজার দুহাজার বছর আগে।

এসব ছাড়া সুতোর কাপড়ে রেশমী কাপড়ে, কাঠের পাটায়, চামড়ার ওপরে, সংস্কৃতে লেখা অনেক বই পাওয়া যায়। এইসব বই বিভিন্ন দেশের মিউজিয়মে রক্ষিত আছে। তারপর ছোটো বড়ো দানপত্র প্রশস্তি প্রভৃতি পাথর ইট আর সোনা রুপো তামা প্রভৃতি ধাতুর পাতের ওপর লেখা পাওয়া যায়।

বইয়ের শ্রেণীবিভাগ

বিখ্যাত পণ্ডিত উইণ্টারনিজ্ লিখছেন—"সাহিত্য শব্দের যা কিছু ব্যাপক অর্থ হোতে পারে তা সমস্তই সংস্কৃতে বর্তমান রয়েছে।" ধর্ম সম্বন্ধীয় বা ঐহিক বিষয়ের (সেক্যুলার) মহাকাব্য, গীতিকবিতা (লিরিক) নাটক, নীতি, বর্ণনাত্মক, অলংকার বৈজ্ঞানিক প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ে সংস্কৃতসাহিত্য ভরপুর। আপাতত আলোচনার সুবিধের জন্য নিম্নলিখিতভাবে সংস্কৃত সাহিত্যকে ভাগ করা গেল—

১। বৈদিক সাহিত্য
২। বেদাঙ্গ
৩। পুরাণ ইতিহাস
৪। ধর্ম অর্থ কাম শাস্ত্র
৫। দর্শন
৬। জৈন ও বৌদ্ধ শাস্ত্র
৭। আয়ুর্বেদ ও উপবেদ
৮। কাব্য নাটক কথা প্রভৃতি
৯। অলংকার
১০। সংকীর্ণকাব্য, টীকা টীপ্পনী
১১। নিবন্ধ
১২। তন্ত্র ও ভক্তিশাস্ত্র
১৩। বিবিধলৌকিক বিষয়
১৪। শিলালিপি ও তাম্রলিপি

এই শ্রেণীবিভাগ কতকটা কাল অনুক্রমে লেখা। আশ্চর্যের বিষয় কোন্ অজ্ঞাতকাল থেকে আজ পর্যন্ত সংস্কৃতসাহিত্য ধারাবাহিকক্রমে রচিত হচ্ছে আর লোকেও আলোচনা করছে। কখনো এই ধারার বিচ্ছেদ ঘটেনি।

রিকেটে সাহেব গর্ব করে বলেছেন যে ইংরেজি সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য এই যে তার ধারাবাহিকতা কখনো ক্ষুন্ন হয়নি। কিন্তু সংস্কৃতের হাজার হাজার বছরের ধারাবাহিকতার কাছে ইংরিজি সাহিত্যের ধারাবাহিকতা ক-দিনের।

বৈদিক সাহিত্য

(১০০০ খ্রীস্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত)

একে চন্দ্র, দুয়ে পক্ষ, তিনে নেত্র, চারে বেদ— এই চারবেদের কথা সবাই শুনেছে। সেই চার বেদ হচ্ছে— ঋক্, যজু, সাম ও অথর্ব।

ঋক্‌বেদ আর অথর্ববেদ বিভিন্ন দিক দিয়ে নানাবিষয়ে ভরা। এইজন্যে এর মহত্ত্বও বেশি। সামবেদ আর যজুর্বেদের বেশি সম্বন্ধ যজ্ঞের সঙ্গে।

বেদ সম্বন্ধে কিছু বলবার আগে একটি কথা বলা আবশ্যক। বেদপন্থীরা বলেন বেদ কারো রচিত নয়। এমন কি ঈশ্বরও রচনা করেননি। বেদ আপনি হয়েছে। একথা অবশ্য বিশ্বাসের কথা। কিন্তু ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে একথা অস্বীকার্য, আমরা যখন ইতিহাসের পথ ধরে চলেছি তখন সব শাস্ত্রকেই তৈরি বলে মেনে নিয়ে চলেছি।

ঋগ্‌বেদের মন্ত্রগুলি কবে রচিত হয় তা নিয়ে নানা মুনির নানামত। বেশির ভাগ মনীষীই স্বীকার করেন যে খ্রীস্টপূর্ব দেড় হাজার বছর আগেই মন্ত্র রচনা শেষ হয়ে গিয়েছিল। ঋগ্‌বেদের সমস্ত মন্ত্র এক ছাঁদের নয়। কোথাও এর ভাষায় প্রাচীনতা কোথাও বা ভাষার নবীনতা পরিলক্ষিত হয়। কোনো কোনো পণ্ডিত বলেন সামবেদের আর অথর্ববেদের অনেক মন্ত্র ঋগ্‌বেদের চেয়ে প্রাচীন। অথর্ববেদে লোকপ্রচলিত এমন অনেক টোটকা ওষুধের কথা আছে যা নাকি জর্মনি আর পোলাণ্ডের প্রচলিত প্রাচীন যুগের টোটকার সঙ্গে মিলে যায়।

বেদের ভাষ্য যা আজকাল প্রচলিত তা বেশিদিনকার নয়। সায়নের ভাষ্য ১৪শ খ্রীস্টাব্দে লেখা। বাঙালি পণ্ডিত নগুড়াচার্যের ভাষ্য ১০ম খ্রীঃ লিখিত। স্কন্দস্বামীর ভাষ্যও কিছু প্রাচীন। এইসব বেদের ব্যাখ্যা পরম্পরা রূপে চলে আসায় কোনো কোনো স্থলে বেদমন্ত্রের অর্থ যথাযথ খোলেনি। তবু ম্যাক্সমূলরের ভাষায় বলতেই হয়—

সায়ন ভাষ্যই বেদবিদ্যার্থীর পক্ষে একমাত্র অন্ধের যষ্টি। ইউরোপীয় পণ্ডিতদের চেষ্টায় এইসব প্রাচীন গ্রন্থের আলোচনায় আরো বোধের পথ সুগম হয়েছে— একথা অস্বীকার করবার জো নেই, তাঁদের ব্যাখ্যায় কিন্তু পরস্পর যথেষ্ট বেমিল আছে। পরে আবার জেন্দ আবেস্তা গ্রন্থ পাওয়া যাবার পর বেদ বুঝবার আরো সুবিধে হয়েছে। এ ছাড়া অ্যাসেরিয়া মিশর ব্যাবিলোনিয়ার ধ্বংসাবশেষে প্রাপ্ত নানা উপকরণে এ বিষয়ে অনেক সাহায্য পাওয়া গেছে। বৈদিক সাহিত্য তিনভাগে বিভক্ত— সংহিতা, ব্রাহ্মণ, ও উপনিষদ। ঋক্ যজু সাম অথর্ব এই চারখানি সংহিতা। এগুলিতে গদ্যে ও পদ্যে রচিত মন্ত্র আছে। যজুর্বেদ আবার কৃষ্ণযজুঃ ও শুক্লযজুঃ ভেদে দুই রকম।

ব্রাহ্মণগুলি গদ্যে লেখা। কচিৎ কোথাও কোথাও পদ্য আছে। কর্মকাণ্ডের ওপরেই ব্রাহ্মণ লিখিত। কখন্ কিভাবে যজ্ঞে আগুন জ্বালতে হবে, কুশ কিভাবে কোথায় রাখতে হবে, কোন্ যজ্ঞে কী আহুতি কিভাবে দিতে হবে এইসব কথাই কোথাও কারণ দেখিয়ে কোথাও বা অমনি লেখা আছে তাছাড়া ব্রাহ্মণে সেই সময়ের প্রচলিত আর লোক পরম্পরায় আগত অনেক গল্পও আছে। এইসব গল্পই পরবর্তী যুগের পুরাণ ইতিহাসের আদি পুরুষ। ব্রাহ্মণগুলিতে সংহিতাগুলির প্রামাণ্য মেনে নেওয়া হয়েছে বলে বোঝা যায় ব্রাহ্মণের আগেই সংহিতাগুলি পূর্ণতা পেয়েছিল। এটা অবশ্য মনে করা উচিত যে সংহিতা আর ব্রাহ্মণের মাঝামাঝি আরো কিছু রচিত হয়ে থাকবে। কেননা মূল সংহিতার অনেক অংশ আর ব্রাহ্মণগ্রন্থেরও অনেকগুলি লুপ্ত হয়ে গিয়েছে। সেইসব গ্রন্থে কী ছিল তা আর জানবার উপায় নেই। যদিচ ব্রাহ্মণগুলির প্রধান লক্ষ্য কর্মকাণ্ডের ওপর তবু এগুলিতে ব্যাকরণ, দর্শন, আয়ুর্বেদ প্রভৃতির অস্পষ্ট আলোচনা আছে। এই ব্রাহ্মণগ্রন্থের পর বেদের দার্শনিক ভাগ, যাতে আত্মা ঈশ্বর জীব জগৎ প্রভৃতির আলোচনা আছে।

এই দর্শনভাগের নাম আরণ্যক বা উপনিষদ্। ভারতের প্রায় সমস্ত দর্শনই এই উপনিষদ্ আশ্রয় করে উদ্ভূত। জৈন আর বৌদ্ধরা উপনিষকে স্বীকার

করেন না কিন্তু তাঁদের মতও উপনিষদে আলোচিত হয়ে খণ্ডিত হয়েছে দেখা যায়।

প্রধান ব্রাহ্মণগুলি এই— ঋগ্‌বেদের— ঐতরেয় আর শাংখ্যায়ন। কৃষ্ণ-যজুর্বেদের— তৈত্তিরীয়। শুক্লযজুর্বেদের— শতপথ। সামবেদের— তাণ্ড্য বা পঞ্চবিংশ, তলবকার বা জৈমিনীয়। অথর্ববেদের—গোপথ।

ব্রাহ্মণের শেষভাগ আরণ্যক, আরণ্যকের শেষ উপনিষদ। অরণ্য অর্থাৎ তপোবনে আলোচনা হয়েছে বলে, অথবা যজ্ঞের সময় আগুন জ্বালানোর জন্যে অরণি (আগুন জ্বালবার কাঠ) ঘষতে ঘষতে আলোচনা হয় বলে এগুলির নাম আরণ্যক, আর উপনিষদ্ মানে একত্র বসে যার আলোচনা হয় (এই কথা অনেক পণ্ডিতেই বলেন)। খ্রীস্টপূর্ব একহাজার বছর আগেই এসব সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছে বলে সকলে স্থির করেছেন।

বেদ আগে চারভাগে ভাগকরা ছিল না। ঋষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বর্তমান আকারে চার ভাগ করে যান। সেজন্য তাঁর নাম হয় বেদব্যাস অর্থাৎ বেদকে যিনি ভাগ করেছেন।

বেদাঙ্গ

(খ্রীস্টপূর্ব ১০০০ বছর থেকে খ্রীস্টপর ৪০০ পর্যন্ত)

বেদ বিভাগ হয়ে যাওয়ার পর এল বেদাঙ্গযুগ। এই যুগে ঋষিদের দৃষ্টি পড়ল নানা দিকে। তার ফলে বেদাঙ্গের উৎপত্তি। বেদের অঙ্গ বেদাঙ্গ। বেদ বুঝতে গেলে এগুলির নিতান্ত দরকার। বেদাঙ্গ হোলো ছয়টি—শিক্ষা, কল্প, নিরুক্ত, ব্যাকরণ, ছন্দ আর জ্যোতিষ।

বেদপন্থীরা বেদকে স্বত উদ্ভূত বা ঈশ্বর প্রকাশিত বলেন, কিন্তু বেদাঙ্গগুলি মুনিঋষিদের রচিত কাজেই কতকগুলির রচয়িতার নাম পাওয়া যায়। মুনি বা ঋষি মানে জ্ঞানী, পণ্ডিত। সেকালে সব মুখস্থ করে রাখতে হোত, বইপত্র

ছিল না। ছোটো ছোটো কথাই মুখস্থ করার পক্ষে সুবিধে। সেইজন্যে ছোটো ছোটো বাক্যে শাস্ত্রের তাৎপর্য রচিত হোত। এগুলিকে সূত্র বলে। সূত্র সবই প্রায় গদ্যে রচিত কচিৎ পদ্যেও দেখা যায়। পরে কিন্তু বড়ো বড়ো লেখাকেও সূত্র বলা হয়েছে বিশেষত জৈন বৌদ্ধ শাস্ত্রে।

এখন বেদাঙ্গগুলির মধ্যে প্রথম, শিক্ষা। তাতে আছে কোন্ অক্ষর কী ভাবে কী রকম স্বরে কী রকম উচ্চারণে পাঠ প্রভৃতি করতে হয়।

অনেকগুলি শিক্ষাগ্রন্থ ছিল তার কিছু লুপ্ত হয়ে গেছে কিছু পাওয়াও যায়। কতকগুলি শিক্ষা ছাপাও হয়েছে। এর মধ্যে পাণিনির শিক্ষাই প্রাধান্য লাভ করেছে। শিক্ষার বদলে শীক্ষা এরকম বানানও পুঁথিতে আছে।

তিনরকম স্বরে বেদ পাঠ হয়, একটা উঁচু স্বর, তাকে বলে উদাত্ত। আর একটা নিচু স্বর তার নাম অনুদাত্ত। আর একটা মাঝারি স্বর তার নাম স্বরিত।

শিক্ষার পর হোলো জ্যোতিষ। চন্দ্রের হ্রাসবৃদ্ধি নিয়ে দিন গোনা হোত। অমাবস্যা পূর্ণিমা প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ তিথিতে বিশেষ বিশেষ যজ্ঞ কর্তব্য। এজন্য দিন ঠিক করতে জ্যোতিষের নিতান্ত আবশ্যক। বেদাঙ্গ জ্যোতিষের প্রণেতা লগধ নামক আচার্য। ঋগ্‌বেদাঙ্গ-যজুর্বেদাঙ্গভেদে এর দুভাগ হোলেও পরস্পরে কোনো তফাত নেই। এতে ৩৬॥টি শ্লোক আছে। এখানি খুব উপযোগী বই।

পরবর্তী কালে হিন্দু জ্যোতিষ বিশেষ বিপুলতা লাভ করে। এই জ্যোতিষকে তিনভাগে ভাগ করা যেতে পারে, সংহিতা, গণিত আর জাতক।

ইউরোপীয় পণ্ডিতদের অনেকের মত মগ (magie) থেকে সংহিতা, আর গ্রীক্‌দের কাছ থেকে জাতক নেওয়া হয়েছে। এই তিনভাগেই সংস্কৃত ভাষায় বিশাল জ্যোতিষশাস্ত্র গড়ে উঠেছে। গণিতে হিন্দুগণ নিজস্ব জ্ঞানের উৎকর্ষ দেখিয়েছেন। আবার কতকগুলি বিষয় এঁরা গ্রীক্‌পণ্ডিতদের কাছ থেকেও নিয়েছেন।

আর্যভট্ট, লল্ল, বরাহ-মিহির, ব্রহ্মগুপ্ত, মুঞ্জাল আর ভাস্করাচার্য - গণিত-জ্যোতিষে বিশেষ সমৃদ্ধি সাধন করেন। এখন পর্যন্ত জ্যোতিষে নানা গ্রন্থ লেখা চলছে। মহামহোপাধ্যায়দ্বয় চন্দ্রশেখর সামন্ত ও সুধাকর দ্বিবেদীর নাম বর্তমান যুগে জ্যোতিষীগণের বিশেষ স্মরণীয়।

আগে বলা হয়েছে বেদের সংহিতা ভাগে ব্রাহ্মণে আর উপনিষদেও প্রচুর পরিমাণে পদ্য আছে। কাজেই পদ্যের ধরন ধারন জানা দরকার। পদ্যকেই সাধারণত ছন্দ বলে। এই ছন্দ বোঝবার জন্যে যে সব ছন্দশাস্ত্র পাওয়া যায় তার মধ্যে প্রাচীন হোলো পিঙ্গলাচার্যকৃত ছন্দঃশাস্ত্র। কোন্ জাতের কবিতায় কত অক্ষর কত পংক্তি থাকবে, পংক্তির মধ্যে কত অক্ষরের পর থেমে আবার পড়তে হবে এইসব বিষয় এতে লেখা। এসব না জানলে পদ্য পড়া ঠিকমতো হয় না। তাই ছন্দঃশাস্ত্রও অবশ্য পাঠ্য। পিঙ্গলআচার্য কবে কোথায় থাকতেন তা জানা যায়নি। প্রাকৃতভাষাতেও একখানা পিঙ্গলছন্দ আছে। তাতে প্রাকৃত ছন্দের কথা আছে, অনেকের মত এখানি ১৪শ খ্রীস্টাব্দের আগেকার নয়।

ছন্দবিষয়ে পরে অনেক বই তৈরি হয়েছে। তার মধ্যে গঙ্গাদাসের ছন্দোমঞ্জরী আর কেদারভট্টের বৃত্তরত্নাকর খুব প্রচলিত বই। আধুনিক যুগে দুখভঞ্জন কবির বাগ্‌বল্লভ ছন্দ সম্বন্ধে সবচেয়ে বড়ো বই।

বৈদিক শব্দ সংগ্রহকে নিঘণ্টু বলে। প্রাচীনতম অভিধানের নিদর্শন এই নিঘণ্টু। যাস্ক আচার্য নিঘণ্টুকর্তা। এক এক বস্তুর যত নাম আছে তা একত্র করে করে এতে সাজানো। যাস্কই এই নিঘণ্টুর ওপর ভাষ্য লেখেন, তার নাম নিরুক্ত। এ দুটি খ্রীস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে লেখা অনেকে বলেন।

নিরুক্তে বৈদিক শব্দের ব্যুৎপত্তি আছে। কোন্ শব্দ কেন বিশেষ অর্থে প্রযুক্ত হয় তারও বিচার আছে। আজকালকার শব্দতাত্ত্বিকরা নিরুক্তের মতে অনেক শব্দের মানে মানেন না, তবু তাঁরা একথা একবাক্যে স্বীকার করেন যে বেদ বুঝতে গেলে নিরুক্তপাঠ অপরিহার্য।

নিরুক্তের একখানি টীকা আছে, যা ১২শ খ্রীস্টাব্দের কাছাকাছি লেখা।

নিঘণ্টুই হোলো পৃথিবীর প্রাচীনতম অভিধান একথা আমাদের মনে রাখা উচিত।

সংস্কৃতে এইরকম অভিধানজাতীয় বই পরবর্তী কালে অনেক রচিত হয়েছে। এর মধ্যে অমরকোষ খ্যাতিতে অগ্রগণ্য। এক এক বস্তুর নাম এগুলিতে পৃথক পৃথক ভাগে সাজানো। আবার এক অক্ষরের পরে ক— যেমন বক, দু অক্ষরের পরে ক— যেমন বালক, তিন অক্ষরের পরে ক— যেমন ক্রমেলক, এ রকম ভাবেও কথা সাজিয়ে অভিধান রচিত হয়েছে; বিশ্বকোষ আর মেদিনীকোষ তার মধ্যে বিখ্যাত। আর আয়ুর্বেদের গাছগাছড়ার নাম আর তাদের গুণের অভিধান হচ্ছে আয়ুর্বৈদিক নিঘণ্টু। তাতে বর্গীকরণ অর্থাৎ শ্রেণীভাগ এমন সুন্দর যা আধুনিক বিজ্ঞান মতেও মেলে।

কল্পসূত্র তিন রকমের— শ্রৌতসূত্র, গৃহ্যসূত্র ও ধর্মসূত্র। আশ্বলায়ন প্রণীত শ্রৌতসূত্র বেদাঙ্গে প্রধানভাবে নিবিষ্ট। শ্রৌতসূত্রে বৈদিক যজ্ঞের বিধান প্রভৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। শ্রৌতসূত্রকে অবলম্বন করে অনেকগুলি বই লেখা হয়েছে ষষ্ঠ খ্রীস্টাব্দ থেকে দ্বাদশ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে।

ধর্মসূত্রে ব্রাহ্মণাদির নিত্যনৈমিত্তিক কাজের কথা আর বিধান আছে। এই ধর্মসূত্রকে অবলম্বন করে— ষষ্ঠ খ্রীস্টাব্দ থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত বহুবিধ পুস্তক রচিত হয়েছে। আপস্তম্ব গৌতম প্রভৃতির লেখা ধর্মসূত্র মান্য। পরবর্তীযুগের স্মৃতি সংহিতা, স্মৃতির টীকা প্রভৃতি নিয়ে এই বিভাগের বহু প্রচার ঘটেছে। স্মৃতিগুলির অবলম্বন প্রধানভাবে ধর্মসূত্র, আর অংশত শ্রৌতসূত্র ও গৃহ্যসূত্র। এর মধ্যে কতক হচ্ছে প্রাচীন কতক হচ্ছে নবীন।

গৃহ্যসূত্রে দ্বিজগণের উপনয়নাদি সংস্কার প্রভৃতির বিধান আছে। সে যুগের সামাজিক আদর্শ অবস্থা বুঝতে হোলে গৃহ্যসূত্র পাঠ অবশ্য কর্তব্য। উইণ্টার্নিজের মতো নৃতত্ত্ববিদগণেরও গৃহ্যসূত্র বিশেষ প্রয়োজনীয়।

প্রাচীন গ্রীক্ রোমানদের বিধিব্যবস্থা জানবার জন্যে ইউরোপীয় পণ্ডিতদের

নানাস্থান থেকে বিক্ষিপ্ত বিষয় একত্র করতে হয়েছে। কিন্তু প্রাচীন ভারতের বিধিব্যবস্থা এক গৃহ্যসূত্র থেকেই জানা যায়।

শ্রৌতসূত্র, ধর্মসূত্র ও গৃহ্যসূত্র ছাড়া আর-একরকম সূত্র আছে যাকে বলে শূল্বসূত্র। এগুলি শ্রৌতসূত্রের সঙ্গে যুক্ত। এতে যজ্ঞবেদির মাপ, আকার ও নির্মাণ সম্বন্ধে আলোচনা আছে। ভারতীয় পণ্ডিতগণ দাবি রাখেন এই শূল্বসূত্রে যে রেখা গণিতের অর্থাৎ জিওমেট্রীর বৈজ্ঞানিক ব্যবহার করা হয়েছে তা পৃথিবীর প্রাচীনতম।

এইবার আসছে ব্যাকরণের কথা। ব্যাকরণ হচ্ছে শব্দগঠন, ও ভাষা নিয়ন্ত্রণের শাস্ত্র। খুব প্রাচীনকালে প্রাতিশাখ্য নামে প্রত্যেক বেদের ভিন্ন ভিন্ন বই ছিল। তাতে কোন্ বেদে কোন্ শব্দ কিভাবে উচ্চারণ করতে হবে, স্বর সঞ্চার, সন্ধি প্রভৃতি অনেক কথাই বলা আছে। প্রাতিশাখ্যকে ব্যাকরণের আদিরূপ বলা যেতে পারে। পরে রীতিমতো সাজিয়ে ব্যাকরণ তৈরি হয়। বর্তমানে ব্যাকরণের সবচেয়ে প্রাচীনতম আচার্য পাণিনি। চতুর্থ খ্রীস্টপূর্ব শতাব্দীতে ইনি গান্ধার (কাবুল) প্রদেশে শালাতুর গ্রামে জন্মান। এঁর মার নাম ছিল দাক্ষী। এঁর লেখা অষ্টাধ্যায়ীসূত্র সর্বত্র বিশেষ প্রতিষ্ঠিত। ইউরোপের পণ্ডিতগণও বলেন যে, সমস্ত পৃথিবীতে এমন পরিপূর্ণ একখানি ব্যাকরণ আজ পর্যন্ত কেউ লেখেননি। অষ্টাধ্যায়ীতে ৩৮৬৩টি সূত্র আছে। তার ওপর কাত্যায়ন শোধন আর সংযোজন করে বার্তিক লেখেন। সূত্র আর বার্তিক মিলালে সংখ্যা হয় প্রায় ৫১০০র ওপর। এই সূত্র বার্তিকের ওপর পতঞ্জলি প্রায় খ্রীস্ট-পূর্ব ১৫০ অব্দে বিখ্যাত মহাভাষ্য লেখেন। এই মহাভাষ্যকে ফণিভাষ্যও বলে। কেননা পতঞ্জলিকে তখনকার লোকে শেষনাগের অবতার বলে মনে করত। আপিশলি, শাকল্য, গার্গ্য প্রভৃতি বৈয়াকরণগণ পাণিনির আগেকার। এঁদের নাম পাণিনির সূত্রে আছে। এঁদের কোনো বই এখনো পাওয়া যায়নি।

পাণিনিব্যাকরণের ওপর পঞ্চাশ ষাটখানির বেশি টীকাটীপ্পনি আছে। পরবর্তী যুগে পাণিনিব্যাকরণের আধারে অনেকে ব্যাকরণ লেখেন কারণ

পাণিনি বড়ো কঠিন, সেজন্যে ব্যাকরণকে সরল ও সহজবোধ্য করবার দরকার হয়। পাণিনির ওপর এখনো পর্যন্ত ব্যাখ্যা রচিত হচ্ছে।

পাণিনি ছাড়া অন্য প্রসিদ্ধ ব্যাকরণ হচ্ছে— কলাপ (২য় খ্রীঃ) চন্দ্র (৬ষ্ঠ খ্রীঃ) জিনেন্দ্র (৮ম খ্রীঃ) সংক্ষিপ্তসার (৯ম খ্রীঃ) সারস্বত (১১শ খ্রীঃ) সুপদ্ম, হেমচন্দ্র (১২শ খ্রীঃ) মুগ্ধবোধ (১৩শ খ্রীঃ), ভট্টোজী দীক্ষিতের প্রণীত সিদ্ধান্তকৌমুদী নামে পাণিনির ব্যাখ্যা ভারতে বর্তমানকালে সবচেয়ে লোকপ্রিয় আর বেশি প্রচলিত।

পুরাণ ইতিহাস

(খ্রীস্টপূর্ব ৬০০ থেকে ৪০০ পর্যন্ত)

পূর্বোক্ত কালকে সূত্রযুগ বলা যেতে পারে কেননা তখন সব শিক্ষণীয় বিষয় সূত্রাকারেই রচিত হোত। এর পর একরকম ছন্দ খুব লোকপ্রিয় হয়ে ওঠে এই ছন্দের নাম অনুষ্টুভ্। সাধারণে শ্লোক নামে প্রসিদ্ধ। এক এক লাইনে আটটি করে অক্ষর। চার লাইনের ছন্দ। এই রকম—

শ্লোকে ষষ্ঠং গুরু জ্ঞেয়ং সর্বত্র লঘু পঞ্চমম্,
দ্বিচতুঃপাদয়োর্ হ্রস্বং সপ্তমং দীর্ঘমন্যয়োঃ

পুরাণ ইতিহাসের বারো আনা ভাগই এই ছন্দে লেখা।

পুরাণে সৃষ্টির কথা বড়ো বড়ো রাজবংশের কথা, ধর্ম কর্ম ব্রত নিয়মের কথা আছে। বৈদিকযুগে কোনো প্রাচীন গল্প বলবার সময় "ইতি হ আস" অর্থাৎ এইরকম ছিল— বলে গল্প আরম্ভ করা হোত। তার থেকে প্রাচীন কোনো গল্প বা কাহিনীর নাম ইতিহাস হয়েছে। উপনিষদ্ আর ব্রাহ্মণের মধ্যে অনেক প্রাচীন ইতিহাস বা গল্প রয়েছে। এখন এইজাতীয় গ্রন্থগুলির মধ্যে সর্বপ্রাচীন রামায়ণ আর মহাভারত। রামায়ণ বাল্মীকি আর মহাভারত বেদব্যাস রচনা

করেন। আজকাল আমরা যে রামায়ণ মহাভারত হাতে পাই তা এক সময়ের লেখা নয়। সেই প্রাচীন লেখার সঙ্গে অনেক অপ্রাচীন লেখার যোগ হয়েছে। যুগ যুগ ধরে এইরকম যোগ হোতে হোতে রামায়ণ মহাভারতের রূপান্তর ঘটেছে। রামায়ণ কাব্যাংশে আর মহাভারত সাহিত্যাংশে সর্বশ্রেষ্ঠ একথা কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না। কাব্য বলতে এখানে কেবল রসকে আর সাহিত্য বলতে বিজ্ঞান নীতি প্রভৃতি বিষয়ের সহিত যোগকে লক্ষ্য করা গেল। খ্রীস্টপূর্ব পাঁচশো বছর আগেই রামায়ণ মহাভারত বর্তমানরূপে পরিণত হয়েছিল।

মহাভারতের তিনরকম সংস্করণ দেখা যায়। দক্ষিণ ভারতীয়, উত্তর ভারতীয় আর মালাবারী। মালাবারের মহাভারত খ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে পূর্ণত্ব প্রাপ্ত— একথা পণ্ডিতদের স্বীকৃত। উত্তর দক্ষিণের মহাভারতের অনেক অংশ পরে যোগকরা, রামায়ণেরও ঐ দশা। পূর্ব ভারতে মধ্যভারতে আর পশ্চিম ভারতে তার প্রকারান্তর ঘটেছে। অধিকাংশ পণ্ডিতের অভিমত— রামায়ণের আদিকাণ্ড আর উত্তরকাণ্ড অনেক পরে লিখে যোগ করা।

রামায়ণ মহাভারতের পরে আসে পুরাণের কথা। ভারতবর্ষে পুরাণ যে কত আছে তার ঠিক নেই। সাধারণত অষ্টাদশ মহাপুরাণ আর অষ্টাদশ উপপুরাণেরই প্রাধান্য। এই মহাপুরাণ আর উপপুরাণ নিয়েও ঢের বাদ বিবাদ আছে—মোটকথা পুরাণ নামক বা তজ্জাতীয় পুস্তক একশোর ওপরে।

পুরাণ রচনা কবে থেকে আরম্ভ হয়েছে তা বলা কঠিন। কেননা রচনা আর বিষয় সন্নিবেশ দেখলে মনে হয় সব পুরাণ একসময়ের রচনা নয়।

পার্জিটর সাহেব পুরাণ নিয়ে অনেক আলোচনা করেছেন তাঁর মতে কোনো কোনো পুরাণ খ্রীস্টপূর্ব অব্দে রচিত। জ্যাক্সনের মতে—খ্রীস্টপূর্ব দুশো বছর আগে পুরাণ নামে যে সব বইপত্র ছিল সেগুলি নানা সম্প্রদায়ের হাতে পড়ে নানারূপ ধরেছে।

আজকালকার পণ্ডিতরা বিশ্বাস করেন যে পুরাণে এমন অনেক কথা আছে যা ঐতিহাসিক আর কতক আর্য-পূর্ব জাতির।

পুরাণ সম্বন্ধে এখনো ভালো করে বৈজ্ঞানিকভাবে আলোচনা হয়নি তবু যতটা এদেশী আর বিদেশী পণ্ডিতেরা আলোচনা করেছেন তাঁদের মধ্যে অধিকাংশেরই মত যে পুরাণের মধ্যে প্রামাণিক ঐতিহাসিক উপাদান যথেষ্ট রয়েছে। আর এটা প্রায় স্থির যে ৫০০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে অনেক পুরাণ পূর্ণতা লাভ করে কিন্তু পরে তাতে অনেক বিষয় লিখে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছ—মায় কুইন্ ভিক্টোরিয়ার ইঙ্গিত পর্যন্ত।

পুরাণে ভারতীয় দর্শন, ধর্মমত, আচার, বিচার সাধনার কথাতে ভরা। কাজেই সেদিক দিয়ে এর মূল্য কম নয়। জৈনরা অনেক পুরাণ লিখেছেন ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রতিদ্বন্দ্বিতায়।

বায়ুপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ আর শ্রীমদ্‌ভাগবত সবচেয়ে প্রধান। ভাগবতের ওপর বহুতর টীকাটীপ্পনি নিবন্ধ লেখা হয়েছে। সমস্ত পুরাণই ব্যাসের নামে রচিত। ব্যাস বলতে অবশ্য অনেককে বোঝাতে পারে। তার মধ্যে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসই সর্বশ্রেষ্ঠ।

পুরাণ সম্বন্ধে একটা বিষয় ভাববার আছে। স্ত্রীলোক শূদ্র আর আচার-হীন ব্রাহ্মণের বেদে অধিকার নেই। তাই তাদের শাস্ত্র কথা জানাবার জন্যে পুরাণের পথ খোলা হয়েছে। পুরাণের বক্তারাও সূতজাতীয়। আজকাল গণশিক্ষা বলতে যে অর্থ আমরা বুঝি, সেই গণশিক্ষা এই পুরাণের দ্বারাই তখনো চলত এখনো চলে আসছে।

পুরাণের গল্পে অতিলৌকিক, অসম্ভব সব কথা আছে। অশিক্ষিত মানুষ সবদেশেই অলৌকিক কথায় আকৃষ্ট হয়। লোক আকর্ষণের জন্যই ঐসব কথা। সেগুলিকে নিছক সত্যি বলে মানতে কুমারিল ভট্ট নিষেধ করে বলেছেন গল্পগুলির তাৎপর্য গ্রহণ করবে, ঘটনাকে নয়।

এই পুরাণ শেষে এত জনপ্রিয় হয়ে পড়ল তাতে বেদচর্চা ঢেকে দিল

বিশেষত পুরাণপাঠকদের একটা মোটা আয়ও বাঁধা ধরা হয়ে গেল। বর্তমান কালেও পুরাণের ওপর ভারতবাসী হিন্দুর টানই বেশি। শেষে এই পুরাণ সমস্ত ধর্মশাস্ত্রের ওপরেও প্রভাব বিস্তার করে। বর্তমান স্মৃতি নিবন্ধগুলিতে গৃহ্যসূত্র, ধর্মসূত্র, ও সংহিতার বচন আর পুরাণের বচনের মধ্যে সংখ্যার তুলনা করলেই তা ধরা পড়ে।

যাই হোক সমস্ত পুরাণগুলির বিষয়বস্তু দেখলে অবাক হয়ে যেতে হয়। অষ্টাদশ মহাপুরাণ— ব্রহ্ম, পদ্ম, বিষ্ণু, শিব, ভাগবত, নারদ, মার্কণ্ডেয়, অগ্নি, ভবিষ্য ব্রহ্মবৈবর্ত, লিঙ্গ, বরাহ স্কন্ধ, বামন, কূর্ম মৎস্য গরুড় ব্রহ্মাণ্ড। এই মহাপুরাণ ছাড়া অনেকগুলি উপপুরাণ আছে।

ধর্মশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র ও কামশাস্ত্র

ধর্মশাস্ত্রের উৎপত্তিস্থল বৈদিক কল্পসূত্র। এই ধর্মশাস্ত্র স্মৃতিশাস্ত্র নামে খ্যাত। এগুলি পৌরাণিক যুগে অর্থাৎ খ্রীস্টপূর্বাব্দে রচিত। এগুলিও সংহিতা নামে প্রসিদ্ধ। মনুসংহিতাই সর্বপ্রধান, তারপর যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতার স্থান। কুড়িখানা সংহিতা নিয়ে স্মৃতিশাস্ত্র। এগুলিকে প্রাচীনস্মৃতি বলে। নব্যস্মৃতির কথা নিবন্ধ অধ্যায়ে বলা যাবে।

বৃহস্পতি শুক্রাচার্য প্রভৃতি অর্থশাস্ত্রের কর্তা। রাজ্য বাণিজ্য প্রভৃতি পরিচালনা করতে হোলে অর্থশাস্ত্রের দরকার। চাণক্য বা কৌটিল্য লিখিত অর্থশাস্ত্রই প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। ছোটো ছোটো অর্থশাস্ত্র অনেক লেখা হয় তার অনেকগুলি লুপ্ত। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র পড়লে দেখা যায় সেকালে রাজকর্মচারী নিয়োগ, নানা বস্তুর ওপর কর নির্ধারণ প্রভৃতি বিশেষ বিধিবদ্ধ ও সুনিয়ন্ত্রিত ছিল।

কামশাস্ত্রের যা প্রাচীন বই মেলে তা বাৎস্যায়নকৃত কামসূত্র। এর টীকা বৌদ্ধপণ্ডিত যশোধর কৃত। এতে গার্হস্থ্য সুখভোগ পারিবারিক নিয়মকানুন আলোচিত। বাৎস্যায়ন তাঁর বইয়ে অনেক প্রাচীন কামশাস্ত্রকারদের নাম

করেছেন। তাঁদের বই এখন পাওয়া যায় না। পরবর্তীকালে এ বিষয়ে অনেক বই রচনা করা হয়েছিল। সেগুলি তত ভালো হয়নি। সেগুলির মধ্যে কক্কোক কৃত রতিরহস্য প্রামাণিক ও আদৃত। মল্লিনাথ প্রভৃতি টীকাকারেরা রতিরহস্য থেকে অনেক প্রমাণ উদ্ধৃত করেছেন।

দর্শনশাস্ত্র

(২০০ খ্রীস্টাব্দ থেকে ৮০০ পর্যন্ত)

উপনিষদের আত্মতত্ত্ব ক্রমেই পরিস্ফুট হয়ে পরবর্তীকালে দর্শনশাস্ত্রে রূপান্তরিত। বেদপন্থার প্রতিদ্বন্দ্বী জৈন আর বৌদ্ধ দর্শন। তবু তার ওপর উপনিষদের প্রভাব বেশ লক্ষিত হয়। কারো কারো মতে দার্শনিক অধ্যাত্মবাদের মূল আর্যেতর জাতির। যাই হোক বর্তমানে প্রচলিত দর্শনগুলির মূল যে উপনিষদ তা অস্বীকার করবার যো নেই।

দর্শনকে মোটামুটি তিনভাগে ভাগ করা যেতে পারে। সাংখ্য, মীমাংসা ও ন্যায়। নিরীশ্বর আর সেশ্বর ভেদে সাংখ্য, পূর্ব আর উত্তর ভেদে মীমাংসা, ন্যায় আর বৈশেষিক ভেদে ন্যায়কে ধরে দর্শন ছয় রকমের। এই ষড়দর্শনই ভারতের গৌরব স্থল। পরে দর্শনগুলির নানা শাখা সৃষ্ট হয়েছে।

সবচেয়ে প্রাচীন দর্শন হল সাংখ্য। কপিলমুনি এর রচয়িতা। ইনি ঈশ্বর সম্বন্ধে স্পষ্ট কিছু স্বীকার করেননি বলে এঁর মত নিরীশ্বর। জৈন আর বৌদ্ধ মতের ওপর সাংখ্যের প্রভাব আছে একথা অনেকে বলেন।

মূল সাংখ্য সূত্রগুলি কালক্রমে নষ্ট হয়ে গেলে তার পর বর্তমান সাংখ্য সূত্র রচিত হয়। এর ভাষ্য করেছেন, অনিরুদ্ধ আর বিজ্ঞানভিক্ষু। কিন্তু সাংখ্য মতের সবচেয়ে প্রামাণিক গ্রন্থ হল, ঈশ্বরকৃষ্ণকৃত সাংখ্যকারিকা। এখানি ৭০টি পদ্যে সম্ভবত ৫০০ খ্রীস্টাব্দে লেখা। সাংখ্যকারিকার ওপর মাঠর গৌড়পাদ, বাচস্পতিমিশ্র প্রভৃতি অনেকের ব্যাখ্যা আছে।

পতঞ্জলিমুনি যোগদর্শন লেখেন। এ মতও অনেকটা সাংখ্যের মত, এতে

ঈশ্বরকে মানা হয়েছে বলে সেশ্বর সাংখ্য বলা হয়। যোগদর্শন পাতঞ্জলদর্শন নামেই খ্যাত। কারো মতে ব্যাকরণের ভাষ্যকার পতঞ্জলি এই দর্শন করেছেন, কারো মতে তা নয়।

পূর্ব মীমাংসা দর্শন শুধু মীমাংসা দর্শন নামে খ্যাত। ব্যাসের শিষ্য জৈমিনি এই দর্শনের কর্তা। সবচেয়ে প্রাচীন যা ভাষ্য তা এই দর্শনের— শবরস্বামীর লেখা। মীমাংসা দর্শনে বেদের প্রামাণ্য, আর যাগযজ্ঞের দ্বারাই ইষ্টলাভ হয় এই সব প্রতিপাদন করা হয়েছে। সমস্ত দর্শনের চেয়ে এই দর্শন আকারে বড়ো।

শবরস্বামীর সম্প্রদায়ের প্রসিদ্ধ কুমারিলভট্ট ভারতবর্ষ থেকে অবৈদিক বৌদ্ধ মত নির্মূল করে বৈদিকমত স্থাপনের চেষ্টা করেন। মীমাংসা দর্শনের প্রধান দুটো শাখা, একটা কুমারিলভট্টের আর একটা প্রভাকরভট্টের।

উত্তর মীমাংসা হচ্ছে বেদান্ত দর্শন। সমস্ত দর্শনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আর সম্মানিত। বেদব্যাস এর কর্তা। এই দর্শনের সূত্রগুলিকে ব্রহ্মসূত্র বলে। এর প্রাচীনভাষ্য হচ্ছে শংকরাচার্যের। এঁর আগেকার যা ভাষ্য তা পাওয়া যায়নি। বিখ্যাত ইউরোপীয় পণ্ডিত ডায়োসনের মত যে, শংকর হচ্ছেন পৃথিবীর তিনজন শ্রেষ্ঠ দার্শনিকের মধ্যে একজন, সে তিন জন— প্লেটো, শংকর ও ক্যান্ট। শংকর মতের ওপর অসংখ্য বই লেখা হয়েছে আর এখনো হচ্ছে।

শংকরের পর ভাস্কর রামানুজ মধ্ব, বল্লভাচার্য, নিম্বার্ক, শ্রীকণ্ঠ, বলদেব প্রভৃতি নিজ নিজ মতের অনুযায়ী বেদান্তসূত্রের ভাষ্য লিখেছেন। আবার এই সব বিভিন্ন মতের ভাষ্যের ওপর অজস্র ছোটো ছোটো বই লেখা হয়েছে।

এখন ন্যায় শাস্ত্রের কথা আসছে। ন্যায় আর বৈশেষিক যেন দুই ভাই, অনেকটা একরকম। অক্ষপাদ গৌতম লিখেছেন ন্যায়সূত্র, কণাদ উলুক্য লিখেছেন বৈশেষিকসূত্র। বাৎস্যায়ন ন্যায়সূত্রের আর প্রশস্তপাদ লেখেন বৈশেষিকসূত্রের ওপর ভাষ্য। এই দুই দর্শন পড়লে খুব বুদ্ধি খোলে সেইজন্য সাধারণে এই দর্শন অত্যন্ত আদর পায়।

অনেক পরে মিথিলার গঙ্গেশপণ্ডিত ন্যায় বৈশেষিককে মিলিয়ে একটা

দার্শনিক মত চালান তাকে বলে নব্য ন্যায়। এই নব্য ন্যায় [illegible]দেব সার্বভৌম, রঘুনাথ শিরোমণি, জগদীশ তর্কালংকার প্রভৃতি নদিয়ার পাণ্ডত[illegible] নতুন রূপ ধারণ করে। আর এর উন্নতি এত হয় যে এখনো পর্যন্ত এই ধারণা— যদি নব্য ন্যায় পড়া না থাকে তবে সে হাজার সংস্কৃত জানলেও শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত বলে গণ্য নয়। মনে রাখতে হবে এই নব্য ন্যায় সৃষ্টিতে বাঙালির হাত বারো আনা। এ সম্বন্ধে যে কত বই আছে তার সংখ্যা নেই। এই নব্য ন্যায়ের ভাষাপরিচ্ছেদ আর তার টীকা সিদ্ধান্ত মুক্তাবলী এমন একখানি বই যে এখানি না পড়লে সংস্কৃত সাহিত্যের যে কোনো বিষয়ের বই ভালো বোঝা যায় না। এই প্রসিদ্ধ সটীক বইখানি বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন লিখে গেছেন। ১৪শ খ্রীস্টাব্দে মাধবাচার্য তাঁর সর্বদর্শনসংগ্রহে ১৬টি দর্শনের মত তুলেছেন। তার মধ্যে অবশ্য প্রধান অপ্রধান মত আছে।

অবৈদিক দর্শনকে নাস্তিক মত বলা হয়। এই মতের লোকেরা বেদ মানেন না। চার্বাক প্রভৃতি আচার্যরা আবার কিছুই মানতেন না— যতকাল বেঁচে থাকবে তত কাল যেমন করে হোক সুখে থাকবার চেষ্টা করবে এই তাঁদের মত। চার্বাকদর্শনের বইপত্র আর পাওয়া যায় না। অবৈদিকমতের যে দুটি প্রবল মত বর্তমান তা হল— জৈন আর বৌদ্ধ। এই জৈনরা শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর ভেদে, আর বৌদ্ধরা হীনযান মহাযান ভেদে দুই রকম। কিন্তু এর মধ্যেও ছোটোখাটো অসংখ্য ভেদ আছে।

জৈনরা প্রাকৃতভাষায় আর সংস্কৃতভাষায় অনেক বই লিখেছেন। আবার বৌদ্ধরা পালিভাষা আর সংস্কৃত ভাষায় বই লিখেছেন। বিশেষ এই যে হীনযানদের বই পালিতে আর মহাযানদের বই সংস্কৃতে লেখা। হীনযান অবশ্য মহাযান থেকে প্রাচীন। জৈনদের ভালো ভালো বই দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যে লেখা। দ্বাদশ খ্রীস্টাব্দে আচার্য হেমচন্দ্র এঁদের প্রধান গুরু ছিলেন। তাঁর মতো প্রতিভাশালী লোক সেযুগে আর ছিল না।

২০০ খ্রীস্টাব্দ থেকে ৮০০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত বৌদ্ধ মতের সংস্কৃত বই লেখা হয়

বিখ্যাত নাগার্জুন আচার্য দ্বিতীয় শতাব্দীতে মহাযান মত প্রবর্তন করেন। এই মত দেখতে দেখতে চারিদিকে ব্যাপ্ত হয়ে পড়ে। শক আর সিথিয়ন রাজারা এই মত গ্রহণ করায় ভারতবর্ষ ছাড়িয়ে বৌদ্ধমত দেশ বিদেশে চলে যায়। জৈন মত অবশ্য সে রকম যায়নি। সংস্কৃত বৌদ্ধগ্রন্থের কতক পালি গ্রন্থের অনুবাদ কতক আবার স্বতন্ত্র। সংস্কৃতের মধ্যেও কতক খারাপসংস্কৃতে লেখা কতক ভালো সংস্কৃতে লেখা।

সংস্কৃত বৌদ্ধ বই অনেক লুপ্ত হয়ে গিয়েছে। তিব্বতী আর চীনে পণ্ডিতরা বহু বইয়ের যথাযথ অনুবাদ করে রেখেছিলেন। বর্তমান কালের অনুসন্ধানের ফলে সেই সব অনুবাদ আর কিছু কিছু মূল বইয়েরও সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। এগুলির সংখ্যাও কম নয়। চীন তিব্বতের মঠে এখনো নানা বিষয়ের অজ্ঞাত সংস্কৃত বই বর্তমান।

এখন আবার যে সব ভালো বই লোপ পেয়েছে অথচ তার চীনে তিব্বতি অনুবাদ আছে, সেই অনুবাদ থেকে সেগুলিকে আবার সংস্কৃতে পরিণত করে ছাপাবার চেষ্টা চলছে।

আয়ুর্বেদ ও অন্যান্য উপবেদ

চার বেদের চার উপবেদ। আয়ুর্বেদ, ধনুর্বেদ, গান্ধর্ববেদ, আর শিল্পবেদ। কেউ কেউ শিল্পবেদের বদলে তন্ত্রশাস্ত্রকে বসান।

এর মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য আয়ুর্বেদ। অথর্ববেদে গাছগাছড়ার প্রচুর বর্ণনা আছে। এই আয়ুর্বেদের আটটি ভাগ বা অঙ্গ। অর্থাৎ আয়ুর্বেদ অষ্টাঙ্গ। সেগুলি এই—

শল্য—Major surgery

শালাক্য—Minor surgery

কায় চিকিৎসা

ভূতবিদ্যা—Demonology

কৌমারভৃত্য—শিশু চিকিৎসা

অগদ তন্ত্র—Toxicology

রসায়ন তন্ত্র—Elixirs

বাজীকরণ—Aphrodisiacs

খ্রীস্টপূর্বাব্দেই এই সব অঙ্গের ওপর বড়ো বড়ো বই লেখা হয়ে গিয়েছিল। তার মধ্যে অনেকগুলি বইয়ের কেবল নামই পাওয়া যায়। মূল বই নষ্ট হয়ে গিয়েছে। পরে চরক আর সুশ্রুত প্রাচীন বইয়ের সার সংকলন করে তাঁদের বিখ্যাত গ্রন্থ রচনা করেন। এই দুখানা বই আজ পর্যন্ত সমস্ত জগতের পণ্ডিতদের দ্রষ্টব্য পুঁথির মধ্যে গণ্য।

চরকের কথা বৌদ্ধ চীনে বইয়েতে আছে। চরক মহারাজ-কনিষ্কের রাজবৈদ্য ছিলেন (খ্রী ১ম শঃ)। সুশ্রুত এঁর পরেকারই লোক, সেণ্ট্রাল এশিয়াতে কাশগড়ে পাওয়া পুঁথিপত্রে চরক সুশ্রুতের নাম পাওয়া গিয়েছে। ভেলসংহিতা নামে আরো একখানা বই পাওয়া গিয়েছে। চরক সুশ্রুতের পরেই বাগ্‌ভট পণ্ডিতের অষ্টাঙ্গহৃদয়। এই তিনখানা বৃহত্রয়ী নামে প্রসিদ্ধ। পরে অসংখ্য বই আয়ুর্বেদ সম্বন্ধে লেখা হয়েছে আর হচ্ছে

তিব্বতে প্রাচীন আয়ুর্বেদের অনুবাদ করা অনেক বই আছে যার মূল গ্রন্থ লুপ্ত।

এর পর গান্ধর্ববেদ অর্থাৎ সংগীতশাস্ত্র আর শিল্পবেদ অর্থাৎ বিশ্বকর্ম শাস্ত্রের যেসব বই পাওয়া যায় তা খুব বেশি দিনকার নয়। তবে বীণা প্রভৃতির নাম লাট্যায়ন শ্রৌত সূত্রে আছে। শিল্পের বই ক্রমে ক্রমে দুএকখানা করে আজকাল পাওয়া যাচ্ছে। ধনুর্বেদ সম্বন্ধে বেশি কিছু পাওয়া যায়নি। পুরাণ আর তন্ত্রের মধ্যে শিল্প শাস্ত্রের অনেক কথা আছে।

বাৎস্যায়নের কামসূত্রে শিল্পবিষয়ে যে চৌষট্টি রকম কলাবিদ্যার উল্লেখ আছে তা দেখলে মনে হয় শিল্পবিষয়ে সেকালে সমাজ সমৃদ্ধ ছিল। কিন্তু অনেকেরই মত যে এইসব শিল্প আর্যেতরজাতির কাছ থেকে নেওয়া।

কাব্য ও নাটক প্রভৃতি

খ্রীস্ট প্রথম শতক পর্যন্ত যেসব কবিতা পাওয়া যায় সেগুলি ধর্ম বা আধ্যাত্মিক সম্বন্ধে লেখা। কিন্তু মনে হয় রসসৃষ্টির উদ্দেশ্যেও সেকালে অনেক কবিতা লেখা হত। সেগুলি লুপ্ত। অনেকের মতে নল দময়ন্তীর উপাখ্যান নাকি প্রাচীনতম।

সংস্কৃত কাব্যের মধ্যে যা পাওয়া যায় তার মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীনতম হচ্ছে অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত আর সৌন্দরনন্দ। মধ্যএশিয়াতে একটা মঠের ধ্বংসাবশেষ খুঁড়ে অনেক বইপত্র পাওয়া গেছে তার মধ্যে অশ্বঘোষের এক খানা নাটকের কতক অংশ মিলেছে। এতে মনে হয় অশ্বঘোষ আরো অনেক বই লিখেছিলেন। অশ্বঘোষের লেখা অতি চমৎকার। উক্ত সময়ের কাছাকাছি কেবল রসসৃষ্টির উদ্দেশ্যেই কবিতা লেখা আরম্ভ হয়। কিন্তু একথা আনুমানিকও হতে পারে কেননা তার আগেকার কোনো বই পাওয়া যায়নি। আর যায়নি বলেই যে ছিল না একথা মানতে অনেকে নারাজ।

কালিদাস কাব্যনাটক লেখকদের মধ্যে সকলের সেরা। অশ্বঘোষ কালিদাসের চেয়ে প্রাচীন। পরে মাঘ ভারবি শ্রীহর্ষ প্রভৃতি কবিরা কাব্য লিখে এই দিকটা সমৃদ্ধ করে তোলেন।

শত শত কবিদের প্রবন্ধ কাব্য উদ্ভটকবিতায় রসসাহিত্য অসামান্য হয়ে ওঠে। কান আর মনের ওপর পদ্যের প্রভাব তাড়াতাড়ি পড়ে বলে কাব্যগুলি প্রায় সবই পদ্যে লেখা।

গদ্যকাব্যও সঙ্গে সঙ্গে লেখা চলছিল। সেই গদ্য এমনভাবে সাজানো যে তার তুলনা অন্য ভাষায় আছে কিনা জানি না। সুবন্ধুর বাসবদত্তা বাণভট্টের কাদম্বরী, দণ্ডীর দশকুমার চরিত প্রভৃতি গদ্যকাব্যের মধ্যে কাদম্বরীই অত্যুৎকৃষ্ট।

পদ্যে আর গদ্যে মিলিয়ে লেখাকে বলে চম্পূ। নল চম্পূ, রামায়ণ চম্পূ ভারত চম্পূ প্রভৃতি খানকয়েক উৎকৃষ্ট চম্পূকাব্য আছে। আবার গল্পবলার উদ্দেশ্যে গদ্য-পদ্য মিশিয়ে ছোটো ছোটো আর একরকম লেখা আছে পঞ্চতন্ত্র, তন্ত্রাখ্যায়িকা,

হিতোপদেশ প্রভৃতি এই জাতীয়। পঞ্চতন্ত্রের গল্পগুলি পৃথিবীর গল্পসাহিত্যের মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন, আর নানা ভাষায় এর অনুবাদ হয়ে ইউরোপ প্রভৃতি দেশে ছড়িয়ে পড়ে। জৈন সংস্কৃতেও ছোটো ছোটো গল্পের অনেক বই আছে।

প্রায় দুহাজার বছর আগে গুণাঢ্য নামে একজন পণ্ডিত বৃহৎকথা নামক একখানা প্রকাণ্ড গল্পের বই প্রাকৃত ভাষায় লেখেন। সোমদেবভট্ট আর ক্ষেমেন্দ্র নামক কাশ্মীরী পণ্ডিত তার সংস্কৃতে অনুবাদ করেন। মূল প্রাকৃতখানা নষ্ট হয়ে গিয়েছে। যথাক্রমে দুখানার নাম কথাসরিৎসাগর আর বৃহৎকথামঞ্জরী। বৃহৎকথাশ্লোকসংগ্রহ নামে আরো একখানা বই পাওয়া গিয়েছে। এই বৃহৎ কথা থেকে পঞ্চতন্ত্রকার ও সংস্কৃত অন্যান্য কবিরা অনেক গল্প নিয়েছেন। বৃহৎকথারও অনেক গল্পের মূল আবার পালিজাতক।

সংস্কৃত নাটকে তার নিজস্ব ভঙ্গি আছে। ইউরোপের পণ্ডিতরা মানাতে চেষ্টা করেছিলেন গ্রীকৃদের কাছ থেকে সংস্কৃত নাটক ধার করা, একথা সম্পূর্ণ ভুল। এখনকার বিলিতী পণ্ডিতরা মানছেন যে ভারতীয় নাটক কারো কাছে ঋণী নয়। সংস্কৃতভাষার সবচেয়ে প্রাচীন নাটক যা পাওয়া গেছে তা অশ্বঘোষের শারীপুত্র প্রকরণ। দুঃখের বিষয় বইখানি সম্পূর্ণ পাওয়া যায়নি। তারপর ভাসের স্থান। ভাসের নাটক খ্রীস্টপূর্বাব্দে রচিত ও সরল। কতকগুলি বেশ ভালো। শূদ্রকের মৃচ্ছকটিক সংস্কৃত নাটকের মধ্যে লোকচরিত্রে সমাজচরিত্রে সবচেয়ে সেরা। এখানি কিন্তু ভাসের একটি অসম্পূর্ণ নাটকের পূরণ। ছোটো সংস্কৃত নাটক কত যে আছে তার সংখ্যা নেই। সকলের মধ্যে কালিদাসের শকুন্তলা, ভাসের প্রতিমা, ভবভূতির উত্তররামচিত, ভট্টনারায়ণের বেণী সংহার, বিশাখ দত্তের মুদ্রারাক্ষস অত্যন্ত বিখ্যাত।

আলোচনাত্মক গ্রন্থ

কাব্য নাটক কিছু জমে উঠলে তখন তার ভালোমন্দ নিয়ে আলোচনা শুরু হল। এই রকম আলোচনা করার ঝোঁক নাকি বেদ-উপনিষদে সূক্ষ্মভাবে

আছে কাজেই প্রাচীন। খ্রীস্টপূর্বাব্দে নটসূত্র রচিত হয়। রস সংগীত অভিনয় প্রভৃতি এতে আলোচিত হয়েছিল। প্রথম খ্রীস্টাব্দে ভরত নাট্যশাস্ত্র সংকলিত হয়। তাতে পূর্ব আচার্যদের মতও তোলা হয়েছে।

পরে ভামহ, দণ্ডী রুদ্রট রুয্যক, ধনিক ভোজরাজ প্রভৃতি পণ্ডিতেরা বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। এই জাতীয় বইয়ের নাম অলংকারশাস্ত্র। এই শাস্ত্রে সবচেয়ে বাহাদুরি নিয়েছেন কাশ্মীরী পণ্ডিতেরা, নব্যন্যায় যেমন বাঙালির হাতে গড়া, তেমনি অলংকারশাস্ত্র কাশ্মীরী পণ্ডিতদের হাতে গড়া।

কাশ্মীরী পণ্ডিত আনন্দবর্ধন ধ্বনি বলে একটা জিনিস স্বীকার করলেন, সেটা হচ্ছে কথার যা অর্থ, তার থেকেও আলাদা একটা অর্থ যা বোঝা যায় তা। যেমন 'সূর্যউদয়ে ফুলগুলি হেসে উঠল' এই কথাতে যে হাসির কথা আছে তা অচেতন ফুলের পক্ষে খাটে না কাজেই হেসে উঠল মানে ফুটল। আবার অনেক দিন পরে বন্ধু এলে যেমন অন্য বন্ধুরা আনন্দে হাসতে থাকে তেমনি রাতের পর সূর্য এলেন, বন্ধুকে অনেকক্ষণ পরে দেখে যেন ফুলগুলি আনন্দ করতে লাগল। এই যে অর্থ এটা হল ধ্বনি।

আনন্দবর্ধনের এই মত অনেকে মেনে নিলেন। ধ্বনি সম্প্রদায় সৃষ্ট হল। আচার্য অভিনব গুপ্ত আনন্দবর্ধনের ধ্বন্যালোকের ওপর আর ভরত নাট্যশাস্ত্রের ওপর বিখ্যাত টীকা লিখে ধ্বনিসম্প্রদায়কে প্রতিষ্ঠিত করে গেলেন। এই মতে মম্মট ভট্ট কাব্যপ্রকাশ, বিশ্বনাথ সাহিত্যদর্পণ, পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ রসগঙ্গাধর নামে বিখ্যাত গ্রন্থ লিখে গেছেন।

ধ্বনি সম্প্রদায়কে বলে নব্য আলংকারিক, আর ভামহ দণ্ডীর মতঅবলম্বীকে বলে প্রাচীন আলংকারিক। প্রাচীন মত নব্য মতের কাছে হটে গিয়েছে। রাজশেখরের কাব্যমীমাংসা একখানি এ বিষয়ে অপূর্ব গ্রন্থ, কিন্তু সেখানির সবটা পাওয়া যায়নি। অলংকার শাস্ত্রের টীকা টীপ্পনীও যথেষ্ট আছে। দুঃখের বিষয় অলংকারশাস্ত্রের এই অভ্যুত্থানে কাব্য নাটকের উন্নতিতে বিশেষ বাধা পড়ল। কেননা শক্তিশালী লেখকগণও অলংকারের নির্দিষ্ট পথ ধরে

চলতে লাগলেন। তার ফলে সবই হয়ে গেল একঘেঁয়ে আর নূতনতাহীন।
এইসব কাব্য সমালোচনা যে সময় চরম উৎকর্ষ লাভ করেছিল ঠিক সেই সময়ই কবিতারও অধঃপতন আরম্ভ হতে লাগল।

এই অলংকার শাস্ত্রেরই একটি শাখা রসশাস্ত্র। স্ত্রীপুরুষের মনোবৃত্তি চাল চলন নিয়ে এর গঠন।

শিংগভূপালের রসার্ণবসুধাকর, ভানুদত্তের রসমঞ্জরী নামকরা বই। এই রসশাস্ত্র সবচেয়ে গৌরব লাভ করেছে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের হাতে পড়ে।

রূপগোস্বামীর ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ও উজ্জ্বলনীলমণি রসশাস্ত্রের প্রতিদ্বন্দ্বি-হীন পুস্তক। শ্রীজীব গোস্বামী ভক্তি ও প্রীতি সন্দর্ভে রসের আলোচনা দার্শনিক দৃষ্টিতে করে গেছেন। শ্রীজীব হলেন রূপগোস্বামীর ভাইপো। অদ্বৈত ব্রহ্ম সিদ্ধিকার বিখ্যাত আচার্য মধুসূদন সরস্বতীও ভক্তি-রসায়নে রস সম্বন্ধে দার্শনিক ভাবে আলোচনা করেছেন।

ছোটো ছোটো কাব্য আর দর্শন প্রভৃতির টীকাটীপ্পনী

(৮০০ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৪শ পর্যন্ত)

কাব্যের অবনতির সময়েও ভালো কবিতা লেখা চলছিল। তার অধিকাংশতেই কৃত্রিমতা আর স্বভাবরঞ্জকতাতে ভরা। এই সময় চরিত্রমূলক ও ঐতিহাসিক বই কিছু লেখা হয়। জৈন আচার্যদের ঐতিহাসিক প্রবন্ধগুলি বিশেষ সমাদৃত। কাশ্মীরের ইতিহাস রাজতরঙ্গিনী বিখ্যাত গ্রন্থ।

ধর্মশাস্ত্রের ওপর টীকা লেখা এই যুগের প্রধান কাজ। কোনো কোনো টীকা আবার নিজেই যেন আলাদা বই। কল্লুকভট্ট, মেধাতিথি, আর গোবিন্দ রাজ মনুসংহিতার টীকাকার। আগের দুজন বাঙালি। অপরার্ক কর্ক, নারায়ণ বরদরাজ, অসহায়, রঙ্গনাথ, সায়ন প্রভৃতি নানা পণ্ডিত, ধর্মশাস্ত্রের টীকাকার।

এই সব টীকা দেখলে এঁদের পাণ্ডিত্য আর বহুদর্শিতা অস্বীকার করবার

যো নেই। এই যুগের বিস্ময়ের বিষয় দর্শনশাস্ত্রের ভাষ্যের টীকাগুলি। একে তো দর্শনের ভাষ্য সহজ নয় তাতে এইসব টীকা না হলে অনেক স্থলে তা দুর্বোধ থেকে যেত। টীকাগুলি ভাষ্যের মত সুক্ষ্মভাবে বুঝিয়েছেন। ভাষ্যকারদের মতোই টীকাকাররা অসাধারণ প্রতিভাশালী ছিলেন। সংস্কৃত সাহিত্যের মহিমা এঁদের হাতে তৈরি একথা বললে বেশি কিছু বলা হয় না।

এই সব টীকাকারদের মধ্যে ষড়দর্শনের টীকাকার বাচস্পতি মিশ্র, আর কাব্যের টীকাকার মল্লিনাথ সংস্কৃতভাষায় শ্রেষ্ঠ আর অমর হয়ে রয়েছেন।

শেষে কিন্তু টীকাকারদের দুর্মতি ঘটল। তাঁরা নিজেদের পাণ্ডিত্য দেখাতে এত ব্যস্ত হয়ে পড়লেন যে মূলের চেয়ে টীকা অত্যন্ত দুর্বোধ হয়ে দাঁড়াল। তখন আবার টীকার টীকা তস্য টীকার দরকার হল। মূল গেল চেপে। পরে টীকাকাররা আর এই দোষের হাত এড়াতে পারলেন না।

তাই ভোজরাজ এঁদের ঠাট্টা করে বলেছেন এঁরা বইয়ের আসল অর্থকে ব্যাখ্যার চোটে ঘুলিয়ে দেন— "বস্তুবিপ্লবকৃতষ্টীকাকৃতঃ প্রায়শঃ"।

নিবন্ধ

ব্যাকরণ অলংকার জ্যোতিষ প্রভৃতি বিষয়ে সংগ্রহ বা রচনা হল নিবন্ধ। গদ্য আর পদ্য দুইয়েই নিবন্ধ রচিত আছে। কেউ কেউ একে প্রকরণও বলে থাকেন। ধারা নগরের রাজা ভোজ ছিলেন বিশেষ বিদ্যোৎসাহী আর হিন্দুদের সংস্কৃতি রক্ষার শেষরাজা। ইনি নানা বিষয়ে বই লিখে গেছেন। তাঁর পরে যখন তুর্কিদের আক্রমণে দেশে বিপ্লব ঘটে সে সময় মূল গ্রন্থ রচনা হ্রাস হয়ে যায়। কিন্তু বড়ো বড়ো নিবন্ধ রচনা হয়, বিশেষত স্মৃতি সম্বন্ধে। ঐ সব নিবন্ধে নানা শাস্ত্র থেকে বিধি ব্যবস্থা সংগ্রহ করে তার আলোচনা করা হয়েছে। বিদেশীর সংঘর্ষে সমাজ তখন বিপন্নপ্রায় কাজেই তার রক্ষায়

জন্য শাস্ত্রবিধির দরকার হয়ে পড়েছিল। ভারতের বিভিন্ন দেশ থেকে এই সব নিবন্ধকার দেখা দিলেন, কনৌজের—লক্ষ্মীধর, কর্ণাটের—মাধবাচার্য, বাংলার—শূলপাণি ভবদেব, জীমূতবাহন, রঘুনন্দন, মিথিলার— চণ্ডেশ্বর আর ছোটো বাচস্পতিমিশ্র, উড়িষ্যার— বিদ্যাকর, নরসিংহ, বুন্দেলখণ্ডের— মিত্রমিশ্র, কুমায়ুনের— অনন্তমিশ্র ভট্ট, ত্রৈলঙ্গের— দেবানভট্ট, কাশ্মীরের— কমলাকর, স্মৃতি নিবন্ধে বিশেষ পাণ্ডিত্য দেখিয়েছেন, আজপর্যন্ত তাঁদের মত সেই সেই দেশে চলছে।

ব্যাকরণ দর্শন প্রভৃতি শাস্ত্রেও ছোটো নিবন্ধ ঢের তৈরি হয়েছে আর এখনো হচ্ছে।

তন্ত্র আর ভক্তি শাস্ত্র

বহু পণ্ডিতের মত তন্ত্র খ্রীস্টীয় সাত শতকে ভারতে এসেছে কিন্তু তন্ত্রগুলি ঘেঁটে দেখলে মনে হয় তা নয়, তন্ত্রশাস্ত্র প্রাক্‌আর্য সুতরাং অতি প্রাচীন। স্যার উড্রফ্ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ এ বিষয়ে যথেষ্ট আলোচনা করে গেছেন। অথর্ব বেদে, (ঋগ্‌বেদেও) তান্ত্রিক ক্রিয়ার আভাস পাওয়া যায়। মনে হয় আর্যরা এদেশের লোকের কাছ থেকে তা শিখে থাকবেন। সে সময়টাতে আর্য অনার্যের মধ্যে ভাবের আদান প্রদান চলতে আরম্ভ হয়েছিল। ৭০০ খ্রীস্টাব্দে নাথ সম্প্রদায় বা যোগী সম্প্রদায়ের প্রাদুর্ভাব ঘটে। এঁদের আচার্য মীননাথ গোরক্ষনাথ প্রভৃতি যে সব গ্রন্থ রচনা করেন তা যোগ আর তন্ত্রে মিশানো। এই মত ভারতের উত্তরপূর্বে খুব ছড়িয়ে পড়ে। তন্ত্র সম্বন্ধে এখনো বিশেষ ভাবে কোনো আলোচনা হয়নি। তন্ত্রের শত শত বই বর্তমান। মহাযানী বৌদ্ধরা তিব্বতীতন্ত্র এনে চালান, এই মত এখনো সর্বত্র জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে চলছে। অনেক বৌদ্ধ দেবদেবী হিন্দু হয়ে গিয়েছেন। এইজন্যে অনেকের অমূলক বিশ্বাস যে বৌদ্ধরাই আদি তান্ত্রিক। বর্তমানে হিন্দুধর্মে বেদের চেয়ে তন্ত্রের প্রভাব বেশি।

অধিকাংশ তন্ত্রেই শৈব আর শাক্ত মতের মহিমা প্রকাশ হয়েছে। কাশ্মীরী পণ্ডিতদের হাতে শৈবতন্ত্রমত পরিপুষ্টি লাভ করে। শাক্তমত বিন্ধ্য পর্বতের দক্ষিণ ভাগে বেশি প্রচলিত হয়।

বর্তমানে ভারতের সর্বত্র উপাসনার ক্ষেত্রে তন্ত্রমতেরই আদর দেখা যায়। বইও যেমন অসংখ্য তার আচার্যেরাও অসংখ্য। তার মধ্যে অভিনব গুপ্ত, ভাস্কর রায়, কেশব মিশ্র, জ্ঞানানন্দ, পূর্ণানন্দ কৃষ্ণানন্দ প্রভৃতি আচার্যগণ বিখ্যাত।

বৌদ্ধ ধর্মের সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধ তন্ত্র ভারতের বাইরেও ছড়িয়ে যায়। এঁদের তন্ত্রের বইও কম নয়। এই যুগেই (অর্থাৎ মধ্যযুগে) আর-এক মতবাদ প্রবল হল যাকে বলে ভক্তিবাদ। শিব আর বিষ্ণুকে নিয়ে এর দুটো বড়ো ধারা চলেছে। বৈষ্ণব ধারা ক্রমে এত বড়ো আর ব্যাপক হয়ে উঠল যে শৈব ধারা ম্লান হয়ে গেল। দক্ষিণ ভারতের আচার্যেরাই এই ভক্তিবাদের প্রবর্তক। এই মতই ভারতে আজকাল সবচেয়ে প্রবল।

মজার কথা যে খ্রীস্টান মিশনারীরা দাবি করেন যে ভক্তিবাদ নাকি খ্রীস্টমত থেকে উৎপন্ন, এসম্বন্ধে প্রমাণ প্রয়োগও যথেষ্ট করেছেন। ভক্তিবাদের মূল কথা ঈশ্বরের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করে উপাসনা করা। এই মত ঋগ্‌বেদের মধ্যেও আছে। ঋগ্‌বেদ খ্রীস্টজন্মের অনেক আগেকার। কাজেই উক্ত মিশ-নারী মত অশ্রদ্ধেয়। অবশ্য এই ভক্তিবাদ দ্রাবিড়দের দ্বারা বিশেষ ভাবে পুনর্গঠিত।

ভক্তিশাস্ত্রের উপযোগী প্রাচীনগ্রন্থ শাণ্ডিল্যসূত্র আর নারদসূত্র। পঞ্চরাত্র গ্রন্থগুলিও এই মতের আশ্রয়। তারপর অসংখ্য ভক্তিগ্রন্থ পুরাণ প্রভৃতি অবলম্বন করে করা। শ্রীমদ্‌ভাগবতই হল এই মতের প্রধান গ্রন্থ। রামানুজ বল্লভ শ্রীচৈতন্য প্রভৃতি আচার্যরা এই মতের জীবনদাতা। এই সব আচার্যদের শিষ্য প্রশিষ্য দ্বারা ভক্তিবাদ বিপুলতা লাভ করেছে।

স্তোত্র সাহিত্য

বহুদেবতার স্তবস্তুতি ভক্তেরা রচনা করেন। সেইসব স্তুতি ক্রমে এত জমে ওঠে যে সেগুলি সংগ্রহ করলে বড়ো বড়ো বই হয়ে দাঁড়ায়। এগুলির মধ্যে এত চমৎকার ভাব তত্ত্বকথা ও কবিত্ব আছে যে দেখলে বিস্মিত হয়ে পড়তে হয়। হিন্দু বৌদ্ধ জৈন, সবাই এই স্তোত্র সাহিত্যে বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।

এই স্তোত্র সাহিত্য নিয়ে বিশেষ আলোচনা এপর্যন্ত হয়নি ।

শিলালিপি আর তাম্রশাসন

এইবার হচ্ছে পুঁথিপত্রের বাইরেকার কথা। পাহাড়ের গায় ইটের ওপর থামের ওপর তামার পাতে এগুলি লেখা। খ্রীস্টপূর্বাব্দেও এই রকম লেখা পাওয়া গিয়েছে। সবচেয়ে পুরানো হল অশোকের শিললেখ। সেগুলি পালি ভাষাতে লেখা।

এইজাতীয় লেখাতে রাজাদের কীর্তিকথা বা দানপত্র প্রভৃতি আছে। ১৫০ খ্রীস্টাব্দে গির্ণার পর্বতে মহাক্ষত্রপ রুদ্রদামনের শিলালেখ চমৎকার ভাষায় লেখা। একে উৎকৃষ্ট গদ্য কাব্যের নমুনা বলে ধরে নিতে পারা যায়। এই শিলালিপি প্রভৃতি অপঠিত থাকলে সংস্কৃত ভাষার একটি প্রধান অঙ্গ অজ্ঞাত থাকে। এই দিকে প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করান ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ। এই সব লিপি সংগ্রহ করে অনেক বই ছাপানো হয়েছে আর হচ্ছে।

নানা জায়গা থেকে তাম্রশাসনও পাওয়া যাচ্ছে, তার ভাষাও চমৎকার।

অন্যান্য বিষয়

ঘরবাড়ি-বাগানতৈরি, পশুচিকিৎসা, রান্নাকরা, খেলাধুলা, শিকার, হাত মুখদেখে লক্ষণ বলা, পরে আরবী পার্শী বইয়ের অনুবাদ প্রভৃতি সংস্কৃত ভাষাতে রয়েছে। আরো অনেক বিষয়ে নতুন নতুন বই খোঁজ করে পাওয়া যাচ্ছে আর ছাপাও হচ্ছে।

পাখির দুটো পাখার মতো হল সংস্কৃতের পক্ষে প্রাকৃত আর পালি-ভাষা। এদুটো না জানলে সংস্কৃতের সবটা জানা হয় না। বিশেষত লোকাচার দেশাচার প্রভৃতি অনেক বিষয় বাদ থেকে যায়, কাজেই এখানে তার খুব সংক্ষেপে নামগুলি করা যাচ্ছে। পালি ভাষায় লেখা বৌদ্ধশাস্ত্র তিনি ভাগে ভাগ করা। তার নাম ত্রিপিটক। সুত্তপিটক বিনয়পিটক আর অভিধম্মপিটক। সুত্তপিটকে বুদ্ধের আর তাঁর জনকয়েক শিষ্যের উপদেশ ও আলাপ আলোচনা আছে। বিনয়পিটকে আচার ব্যবহার, ও অভিধম্মপিটকে দর্শন আলোচিত হয়েছে। সুত্তপিটক দীঘ নিকায়, মজ্ঝিম নিকায়, সংযুত্ত নিকায়, অংগুত্তর নিকায়, ও খুদ্দক নিকায় এই পাঁচ ভাগে বিভক্ত। এর মধ্যে খুদ্দকপাঠ, ধম্মপদ, উদান, ইতিবুত্তক, সুত্তনিপাত, বিমানবত্থু, পেতবত্থ্, থেরগাথা, থেরীগাথা, জাতক, নিদ্দেশ, পটিসম্ভিদা, অপদান, বুদ্ধবংস ও চরিয়াপিটক এই পনের খানা বই খুদ্দক নিকায়ের অন্তর্গত। পারাজিকা, পাচিত্তিয়, মহাবগ্গ চুল্লবগ্গ ও পরিবার এই পাঁচখানা বই নিয়ে বিনয় পিটক। ধম্মসংগণি বিভঙ্গ কথাবত্থু, পুগ্গল পঞ্ঞত্তি, ধাতুকথা যমক, পট্ঠান এই সাতখানা বই নিয়ে অভিধম্ম পিটক। এই ত্রিপিটকের ওপর বুদ্ধঘোষ ও ধর্মপাল প্রভৃতি আচার্যেরা অথকথা অর্থাৎ ব্যাখ্যা লিখেছেন। এ ছাড়া ত্রিপিটক অবলম্বন করে আরো অনেকে বই লিখেছেন। মিলিন্দ পঞ্হো, বিসুদ্ধি মগ্গ, আর অভিধম্মত্থসংগহ এই তিনখানি মূল ত্রিপিটকের

অন্তর্গত না হলেও অত্যন্ত প্রামাণিক গ্রন্থ। পালিতে কাব্য অলংকার ব্যাকরণ ছন্দ বিষয়েরও বই আছে।

পালিতে লেখা বইগুলি হীনযান অর্থাৎ দক্ষিণী বৌদ্ধদের। উত্তরী বৌদ্ধ অর্থাৎ মহাযানীদের বই সংস্কৃত ভাষায় লেখা। মহাযানীদের বইয়ের সংখ্যা বিপুল। তার মধ্যে দর্শনের বইগুলি চিন্তায় যুক্তিতে বিচারে অতুলনীয়। একথা বললে বেশি বলা হবে না যে এই সব বৌদ্ধ দর্শনগুলি সামনে থাকাতে আর তারই ঘাতপ্রতিঘাতে হিন্দু দর্শনগুলি বিকাশ লাভ করেছে। অশ্বঘোষ মাতৃচেট, আর্যশূর নাগার্জুন আর্যদেব বসুবন্ধু অসংগ শান্তিদেব প্রভৃতি আচার্যগণ মহাযানীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে গণ্য। সংস্কৃতে ব্যাকরণ সাহিত্য অলংকার প্রভৃতি নানা বিষয়ে উৎকৃষ্ট বই রচনা করেছেন মহাযানী আচার্যেরা।

শ্বেতাম্বর আর দিগম্বর ভেদে জৈন সম্প্রদায় দুরকম। এঁদের মূলগ্রন্থ সব প্রাকৃত ভাষায় লেখা। দু দলের প্রাকৃত দু রকমের। জৈনদের প্রধান বই হল এগার অঙ্গ আর বার উপাঙ্গ। এগার অঙ্গ— আয়ারংগ সুত্ত; সুয়গড়ংগ, ঠাণংগ, সমবায়ংগ, ভগবতী বা বিবিহপন্নত্তি, নায়াধম্মকহা, উপাসগদসা, অন্তগড দসা, অণুত্তরোববায়িদসা, পণ্ণহবাগরণ, বিবাগসুত্ত। বার উপাঙ্গ— উববায়ি, রায়পসেনি, জীবাভিগম, পন্নবনা, সূরপন্নত্তি, জম্বুদীব-পন্নত্তি চন্দপন্নত্তি, নিরয়াবলী, কপ্পাবংডসিয়া, পুপ্‌ফচুলিয়া, বহ্নিদসা, দসপইন্না।

এই অঙ্গ উপাঙ্গ নিয়ে দুই দলে কিছু কিছু ভেদ আছে। জৈন আচার্যগণ আরো অনেক বই প্রাকৃত ও সংস্কৃত উভয় ভাষাতেই লিখে গেছেন। এঁদের মধ্যে সর্বতোমুখী প্রতিভাবান আচার্য হেমচন্দ্র সূরি। সংস্কৃত সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগে এঁর লেখা বইগুলি উৎকৃষ্ট ও প্রামাণিক। কুন্দকুন্দাচার্য, উমাস্বাতি, বিমল সূরি, হরিভদ্র সূরি প্রভৃতি এঁদের মধ্যে বিখ্যাত।

ভাষার বৈশিষ্ট্য

সাজসজ্জা মানুষের সংস্কারগত। দেহ-গেহ প্রভৃতিকে মনোরম করবার চেষ্টা মানুষে অক্লান্তভাবে করে আসছে তখন ভাষাই বা বাদ যাবে কেন। এই ভাষার সাজসজ্জা বিধিতে ধীরে ধীরে গড়ে উঠল অলংকার শাস্ত্রের পথ। একদল শব্দের সাজে আর একদল অর্থের সাজে নিরত হলেন। সাহিত্যের ভালোমন্দ অবশ্য নির্ভর করল অর্থের সাজের ওপর।

কিন্তু শব্দ নিয়ে যাঁরা সাজ সজ্জায় লেগেছেন তাঁদের বাহাদুরিও কম নয়। পণ্ডিতরা এই পথকে উৎকৃষ্ট বলে স্বীকার না করলেও এ কথা বলেছেন যে মনকে হালকা করার জন্যে এই সব শব্দেরসাজওয়ালা কাব্য চাই।

এর ফলে দেখা যায় সংস্কৃত ভাষার নমনীয়তা অতি আশ্চর্য। পৃথিবীর আর কোনো ভাষায় এ রকম আছে কি না জানি না। ভাষাকে যে রকম ইচ্ছে সেই রকম চালানো যায়।

একই বইয়ে আছে রামায়ণ আর মহাভারতের ঘটনা মিলে মিশে। ইচ্ছে হয় রামায়ণ পড়ো না হয় মহাভারত[১]। সোজা করে শ্লোক পড়লে রামকথা আর উলটো করে পড়লে হবে কৃষ্ণকথা[২]। একদিকে নাটকের পরিশিষ্ট অন্যদিকে পর পর সাজানো ব্যাকরণের সূত্র ও উদাহরণ[৩]। একই কাব্য একবার বৈরাগ্য ভাবের আর একবার আদিরসের অর্থে ভরা। এই রকম অজস্র বৈচিত্র্য সংস্কৃত ভাষায় রয়েছে। তারপর হেঁয়ালি প্রভৃতিও কম নয়। এক অক্ষর বা দু অক্ষর দিয়ে শ্লোক তৈরী, সোজা করে পড়লে সংস্কৃত উলটো করে পড়লে প্রাকৃত, নানারকম ছবি এঁকে তার ওপর শ্লোক সাজানো প্রভৃতি হরেক রকম কৌতুকজনক বিষয় রয়েছে। আগেই বলেছি এগুলি কেবল মনোরঞ্জন ও কৌতুকের জন্য রচিত হত। এ প্রসঙ্গে কাদম্বরীর রাজা শূদ্রকের অবসর বিনোদের ব্যাপারে বাণভট্টের বর্ণনা দ্রষ্টব্য।

১ কবিরাজ পণ্ডিতের রাঘব পাণ্ডবীয় ২ সূর্যসূরির— রামকৃষ্ণবিলোম কাব্য

৩ কৃষ্ণানন্দের— অন্তর্ব্যাকরণ নাট্যপরিশিষ্ট

আর একটা কথা লক্ষ্য করা দরকার, সংস্কৃতকাব্য বা নাটক যা কিছু, তার বর্ণনা ও ক্ষেত্র শহরকে নিয়ে, গ্রাম নিয়ে নয়। কাজেই শহুরে রীতিনীতি আর বড়োমানুষি এতে পরিস্ফুট। স্মৃতিশাস্ত্রগুলি আবার শহর নিয়ে নয়, গ্রাম নিয়ে। কেননা স্মৃতির ব্যবস্থা অনুসারে দিনচর্যা শহরে অসম্ভব তা পড়লেই বোঝা যায়। কাজেই কাব্য সাহিত্য আর স্মৃতি এই দুই শাস্ত্রের মধ্যে মধ্যে চলেছে দুটো ধারা একটা শহুরে আর একটা গ্রাম্য।

এইবার সংস্কৃত সাহিত্যের মধ্যে কতগুলি মেনে নেওয়া বিষয় চলে আসছে সেগুলির সম্বন্ধে কিছু উল্লেখ করব কেননা এগুলির প্রভাব সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে যুক্ত যেসব উপভাষা আছে তার ওপরেও বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে রয়েছে। এগুলিকে বলা হয় "কবিসময়" অর্থাৎ কবিদের মেনে নেওয়া বিষয়। বাস্তব জগতে তা সত্যও হতে পারে মিথ্যাও হতে পারে।

চকোর জ্যোৎস্না পান করে, বর্ষাকালে হাঁসেরা মানস সরোবরে চলে যায়. মেয়েদের পায়ের আঘাতে অশোক ফোটে, তারা মুখে মদ নিয়ে বকুল গাছের ওপর ছিটিয়ে দিলে বকুল ফুল ফোটে। তেমনি মেয়েদের স্পর্শে প্রিয়ংগু, চাহনিতে তিলক, আলিঙ্গনে— কুরুবক, নর্মবাক্যে— মন্দার, মৃদুহাসিতে—চম্পক, ফুঁয়ে—আম, গানে— নমেরু, আর নাচে—কর্ণিকারের ফুল ফোটে। দিনে পদ্মের, রাতে কুমুদের বিকাশ, মেঘের ডাকে ময়ূরের নাচ, অশোকের ফলহীনতা, বসন্তে জাতীপুষ্পের অভাব, চন্দন অগুরু প্রভৃতি যেসব গাছের কাঠেই গন্ধ সেসব গাছের পুষ্পহীনতা কবিরা মেনে নিয়েছেন। তারপর কবিদের রূপ বর্ণনাতেও একটা মোটামুটি নিয়ম বাঁধা আছে। যেমন চোখ হবে খঞ্জন, হরিণচোখ, পদ্ম, মৎস্য, চকোর প্রভৃতির মতো। অর্থাৎ কোথাও হরিণের চোখের মতো চঞ্চল। আবার কোথাও খঞ্জনের দেহের মতো কালো সাদায় মেশানো। এসবস্থলে ভাব অনুসারে অর্থ ধরতে হয়। নাক হবে তিল ফুলের মতো। ঠোঁট হবে আকৃতিতে বিম্ব ফলের মতো, রঙে বন্ধুক পুষ্পের (বাঁধুলী ফুলের) মতো। এই রকম সমস্ত শরীরের বর্ণনায় একটা একটা বিশেষ বস্তুর সঙ্গে তুলনা করা আছে আর

অন্যান্য বিষয়েও এই রকম উপমা বা তুলনা আছে। এর প্রভাব বর্তমান বাংলাসাহিত্যেও কম নয়।

কোনো স্থলে ভিন্নার্থক শব্দকে একার্থক বলে ধরে নেওয়া হয়েছে যেমন মীনকেতন মকরকেতন শশাংক হরিণাংক। এসবস্থলে মীন মকর শশ হরিণ এক নয়। তেমনি নীল কৃষ্ণ পাণ্ডর শ্বেত পাণ্ডু প্রভৃতি রং পরস্পর মেশামেশি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কতগুলি বিষয়ে আবার কবিরা স্বাধীন নন যেমন শশাংক স্থলে শশী চলবে কিন্তু মৃগাংকের স্থলে মৃগী চলবে না। এই রকম অনেক খুঁটিনাটি বিষয় আছে, যা সাহিত্য পড়তে পড়তেই জানা যায়।

শেষকথা

যেমন বিশাল কোনো স্থানকে দূর থেকে দেখলে তার একটি অখণ্ড ও আবছা দৃশ্য চোখে পড়ে, বিশাল সংস্কৃত সাহিত্যকে এই প্রবন্ধে দূর থেকেই তেমনি দেখা গেল। কেননা সমস্ত খুঁটিয়ে ও নিঃশেষে নাম নিয়ে সংস্কৃত সাহিত্যের কথা বলা অসম্ভব। এই বইয়ে 'সাহিত্য' শব্দের ব্যুৎপত্তি লভ্য অর্থ ধরা হয়েছে—অর্থাৎ সংস্কৃতভাষার যে যে বিষয়ের **সহিত** সম্বন্ধ আছে তাই সংস্কৃত সাহিত্য (সহিত+ণ্য)।

যে কয়েকটি বিষয়ের ওপর লক্ষ্য রাখা উচিত, সে সম্বন্ধে কিছু বলে আমাদের বক্তব্য শেষ করব।

Dead language কথাটা বিদেশী আমদানি। এর মানে মৃতভাষা। এই বিশেষণটি সংস্কৃতভাষার ঘাড়ে চাপানো হয়েছে। এখন মৃতভাষা বলতে যদি অপ্রচলিত অর্থাৎ যা আটপৌরে কথাবার্তায় চলে না তাকেই বোঝায়, তবে তো বাংলা সাধুভাষাও মৃতভাষা। যাতে বই পত্র আর এখন লেখে না তাই যদি মৃতভাষা হয়, তবে ভারতবর্ষের নানা প্রান্ত থেকে বছর বছর নতুন সংস্কৃত বই, সাপ্তাহিক মাসিক বাৎসরিক প্রভৃতি পত্রিকাদি অনেক বেরুচ্ছে, যিনি এ দিকের খবর রাখেন তিনি জানেন। সংস্কৃত শেখার বিদ্যালয় সারাভারতে

সংখ্যায় স্কুলকলেজের চেয়ে কম বোধ হয় না। সহস্র সহস্র বিদ্যার্থী এ ভাষা শ্রদ্ধাসহকারে পড়ে। কাজেই কী হিসাবে সংস্কৃত মৃতভাষা তা ঠিকমতো বোঝা যায় না। সুতরাং সংস্কৃতকে মৃতভাষা বলার চেয়ে "সুপ্রাচীন" ভাষা বলাই বুদ্ধিমানের কাজ।

নেপাল থেকে কুমারিকা আর বম্বে থেকে আসাম পর্যন্ত এই ভাষার চর্চা এখনো পুরোদস্তুর মতো বর্তমান। বিভিন্ন ভাষায় ভরা এই ভারতের প্রায় প্রত্যেক গ্রামে কোনো না কোনো সংস্কৃত জানা "পণ্ডিতজী" পাওয়া যায়ই কাজেই সংস্কৃত বলতে পারলে ভারতের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত অনায়াসে ঘুরে আসা চলে।

অনেকে এখনো সংস্কৃতে বিশেষভাবে প্রতিভার পরিচয় দিয়ে যাচ্ছেন কিন্তু তার খোঁজ রাখেন ক'জন।

বিদেশীরাজকতা ও মিশনারীদের প্রভাবে সংস্কৃতের ওপর হালে-শিক্ষিত সাধারণের একটা অনাদর অবজ্ঞা বয়ে চললেও সংস্কৃতের গৌরব কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয়নি। বিদেশীয় মনীষীদের সংস্কৃতআলোচনা প্রভৃতি এদিকে দৃষ্টান্তস্বরূপে বর্তমান।

আজকালকার শিক্ষিতদের মধ্যে বৈজ্ঞানিকভাবে ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে সংস্কৃত আলোচনার পথ প্রদর্শক ইউরোপীয় পণ্ডিতরা। কিন্তু বিদেশী দৃষ্টিতে ভারতীয় সাহিত্যের সমালোচনায় এদেশি সাহিত্যের মর্যাদা যে ঠিকমতো সবজায়গায় রক্ষা করা হয়নি সেকথা বলাই বাহুল্য। আধুনিক এদেশি পণ্ডিতেরা পাশ্চাত্যপণ্ডিতদের মতই তাঁদের বইয়ে উদ্‌গীরণ করছেন। তার কারণ বোধ হয় মূলবইগুলি আদ্যোপান্ত পাঠ করার সময় অভাব। তারপর ভারতবর্ষের এক এক প্রান্তের আচার ব্যবহার বিভিন্ন। সমাজ ও ব্যবহারের প্রতিবিম্ব হল সাহিত্য। কাজেই অবন্তীপুরীর গণিকা বসন্তসেনার বিবাহিত হয়ে ভদ্রঘরের বধূরূপে পরিগণিত হওয়া যে সমস্ত ভারতের আচার নয় তা সহজেই বোঝা যায়। সুতরাং

যে কোনো একখানা বইয়ে বিশেষ কিছু দেখলে সমস্ত ভারতের ঘাড়ে তা চাপানো সমালোচকদের পক্ষে অপকার্য।

শত শত বছরের আগেকার বই নিয়ে সমালোচনার সময় সেই সময়কার আবহাওয়া আর ঠিক ঐ সময়ে অন্য দেশের ও সাহিত্যের অবস্থা পাশাপাশি রেখে বিচার করা আবশ্যক। সংস্কৃত সাহিত্যের আলোচনার পক্ষে তা ঠিক হয়নি।

দু'তিন হাজার বছর ধরে যে ভাষার ধারা সমানে চলে আসছে যার ধারা কখনো বন্ধ হয়নি তার বিশালতা কতদূর হতে পারে তা সহজে বোঝা যায়।

রাষ্ট্রবিপ্লব, উই প্রভৃতি পোকায় ও অযত্নে হাজার হাজার বই নষ্ট হয়ে গেছে। তক্ষশিলা নালান্দা প্রভৃতির বিরাট পুস্তকালয় আক্রমণকারী বিদ্রোহীরা পুড়িয়ে দেয়, তাতেও অজস্র বই নষ্ট হয়ে গেছে। আবার বিদেশী পরিব্রাজক ও রাজ-রাজড়ারা এমন অনেক বই নিয়ে গেছেন যার অন্য কপি এদেশে নেই। এখনো অনেক ব্রাহ্মণপণ্ডিতের ঘরে দুর্লভ পুঁথিপত্র নষ্ট হতে বসেছে। এমনিভাবে ধ্বংসের নানা পথ থেকে যে বইগুলি বেঁচে আছে তার একটা সদ্‌গতি করার চেষ্টা আজকাল চলছে। তার ফলে অনেক অমূল্য বই পাওয়া যাচ্ছে। একটা উদাহরণ এখানে দেওয়া গেল। শালিহোত্র হচ্ছেন অশ্ববৈদ্য। ঘোড়ার চিকিৎসা সম্বন্ধে তাঁর উৎকৃষ্ট গ্রন্থের উল্লেখ শুধু প্রাচীন টীকাকারদের লেখায় পাওয়া যেত আসল বইখানি পাওয়া যায়নি। একদিন একটা লোক দোকানে কতকগুলি পুরানো কাগজপত্র বিক্রি করতে যায় তার মধ্যে একখানা আস্ত পুঁথি দেখে একজন, কোনো অধ্যাপককে দেখতে দেন, সেটা কী। অধ্যাপক দেখলেন সেখানা শালিহোত্রের পুঁথি। তিনি তখনি কিনে এসিয়াটিক সোসাইটিকে দেন তাঁরা ছাপিয়ে বার করেন। তারপর ঐ বইয়ের আর দ্বিতীয় কপি পাওয়া যায়নি। এমনিভাবে অজ্ঞাতে মূর্খদের হাতে পড়ে অনেক বই চিরদিনের মতো লুপ্ত হয়ে গেছে।

যেসব পণ্ডিতমণ্ডলী নানাদিক থেকে উপেক্ষা অবজ্ঞা দারিদ্র্য প্রভৃতি

অম্লানবদনে মেনে নিয়ে এই ভারতীয় জ্ঞানধারাকে আজ পর্যন্ত চালিয়ে নিয়ে আসছেন তাঁদের কথা অনেকেরই অজ্ঞাত। নতুন চিন্তা দ্বারাও যাঁরা সংস্কৃতভাষাকে পুষ্ট করেছেন তাঁদেরও ঐ দশা। এসম্বন্ধে বলা যেতে পারে ম, ম, রাখালদাসের অদ্বৈতবাদখণ্ডন, ম,ম, রামাবতারের শক্তি (সপ্তম) দর্শন, ম,ম, পঞ্চাননের শক্তিভাষ্য প্রভৃতি গ্রন্থের প্রকৃত মূল্য নির্ণয় হবে আরো কয়েক শতাব্দী পরে।

বর্তমান যুগে পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতদের সম্প্রসার বিশ্লেষণশক্তি আর ভারতীয় পণ্ডিতদের গভীরতা এই দুয়ের মিশ্রণ যদি সংস্কৃত-শিক্ষার্থীদের মন অধিকার করতে পারে তবে অচিরাৎ এই ভাষার চর্চা আবার নতুন রূপ নিয়ে বিস্ময় জাগাবে সমস্ত জগতের মনীষীদের মনে।

পৃ ১৯ পং, ২৩ দ্বাদশ স্থলে বারোশো,

পৃ ২৫ পং, ১১ অদ্বৈতব্রহ্মসিদ্ধি স্থলে অদ্বৈতসিদ্ধি হবে।

। ১৩৫০ ।

১. সাহিত্যের স্বরূপ : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
২. কুটিরশিল্প : শ্রীরাজশেখর বসু
৩. ভারতের সংস্কৃতি : শ্রীক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী
৪. বাংলার ব্রত : শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৫. জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার : শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য
৬. মায়াবাদ : মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ
৭. ভারতের খনিজ : শ্রীরাজশেখর বসু
৮. বিশ্বের উপাদান : শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য
৯. হিন্দু রসায়নী বিদ্যা : আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়
১০. নক্ষত্র-পরিচয় : অধ্যাপক শ্রীপ্রমথনাথ সেনগুপ্ত
১১. শারীরবৃত্ত : ডক্টর রুদ্রেন্দ্রকুমার পাল
১২. প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী : ডক্টর সুকুমার সেন
১৩. বিজ্ঞান ও বিশ্বজগৎ : অধ্যাপক শ্রীপ্রিয়দারঞ্জন রায়
১৪. আয়ুর্বেদ-পরিচয় : মহামহোপাধ্যায় গণনাথ সেন
১৫. বঙ্গীয় নাট্যশালা : শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
১৬. রঞ্জন-দ্রব্য : ডক্টর দুঃখহরণ চক্রবর্তী
১৭, জমি ও চাষ : ডক্টর সত্যপ্রসাদ রায় চৌধুরী
১৮. যুদ্ধোত্তর বাংলার কৃষি-শিল্প : ডক্টর মুহম্মদ কুদরত-এ-খুদা

। ১৩৫১ ।

১৯. রায়তের কথা : শ্রীপ্রমথ চৌধুরী
২০. জমির মালিক : শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত
২১. বাংলার চাষী : শ্রীশান্তিপ্রিয় বসু
২২. বাংলার রায়ত ও জমিদার : ডক্টর শচীন সেন
২৩. আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা : অধ্যাপক শ্রীঅনাথনাথ বসু
২৪. দর্শনের রূপ ও অভিব্যক্তি : শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য
২৫. বেদান্ত-দর্শন : ডক্টর রমা চৌধুরী
২৬. যোগ-পরিচয় : ডক্টর মহেন্দ্রনাথ সরকার
২৭. রসায়নের ব্যবহার : ডক্টর সর্বাণীসহায় গুহ সরকার
২৮. রমনের আবিষ্কার : ডক্টর জগন্নাথ গুপ্ত
২৯. ভারতের বনজ : শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু
৩০. ভারতবর্ষের অর্থ নৈতিক ইতিহাস : রমেশচন্দ্র দত্ত
৩১. ধনবিজ্ঞান : অধ্যাপক শ্রীভবতোষ দত্ত
৩২. শিল্পকথা : শ্রীনন্দলাল বসু
৩৩. বাংলা সাময়িক সাহিত্য : শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যা
৩৪. মেগাস্থেনীসের ভারত-বিবরণ : রজনীকান্ত গুহ
৩৫. বেতার : ডক্টর সতীশরঞ্জন খাস্তগীর